৪র্থ, বর্ষ ; ১ম ও ২য় সংখ্যা । আশ্বিন, ১৩৩৪ ।

না

খুলনা বি, কে, ইউনিয়ন স্কুলের

মুখপত্র ।

President :—

Khirode Chandra Sen, B. A.,

HEAD MASTER.

প্রধান সম্পাদক—মৌলবী সৈয়দ আহম্মদ আলী, এল, টি,

সহ-সম্পাদক—শ্রীসন্তোষকুমার মিত্র ।

...ল্য ৵১০ আনা । বার্ষিক মূল্য ।৵০ আনা ।

সূচীপত্র।

বর্ষ আবাহন।

বসন্তের অনুচর নূতন বরষ!
এসগো নামিয়া ভবে ঢালিতে হরষ।
তব অভিষেক তরে প্রকৃতি সুন্দরী,
সাজিয়াছে কিবা সাজে আহা! মরি মরি!
নব পুষ্প-কিসলয়ে শোভে তরুদল,
শ্যাম দুর্ব্বাদলে মাঠ করে ঢল ঢল!
মধুপ গুঞ্জন আর পাপিয়ার তান
বহায় জগৎ-প্রাণে হরষের বান।
মধুর পরশে আহা! মলয় সমীর,
ছড়ায় সবার অঙ্গে লহর হাসির।
নবীন জলদমালা আকাশের গায়
সৌদামিনী সতী সনে ভ্রমিয়া বেড়ায়।
সজ্জিত বিপণি-মালা পল্লব-প্রসূনে
সব আয়োজন সখে! তব আবাহনে।
তেয়াগিয়া কলুষতা, দীনতা, হীনতা
শ্রেয়ঃ প্রেয় নূতনের এনেছ বারতা।
ষড়ঋতুরূপে তুমি পূর্ণ বার মাস,—
স্রষ্টার মহিমা সদা করহ প্রকাশ।—
গ্রীষ্মের দাহন পরে বরষার ধারা
ছুটায় ধরার বুকে শান্তির ফোয়ারা।
শারদীয় কৌমুদীর স্নিগ্ধ অংশুমালা
বিদূরিত হ'লে, আসে হেমন্তের পালা,
হেমন্তের পরে শীত হিমানী ছড়ায়
আড়ষ্ট যাহার তেজে জীব সমুদায়।
আবার মলয় বায় হ'লে প্রবাহিত
ঋতুরাজ আগমন হয় বিঘোষিত।
যাঁর মহিমায় বর্ষ! ধর এতরূপ
বিশ্বস্রষ্টা নাম তার সকলের ভূপ।

সম্পাদক।

মাতৃভক্তি।

(লেখক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ১ম শ্রেণী।)

স্নেহশীলা জননী কত কষ্টেই না আমাদের দশ মাস দশ দিন জঠরে ধারণ করিয়া থাকেন। আমরা যদি সেই করুণাময়ী জননীর স্নেহপূর্ণ সহানুভূতি না পাইতাম তাহা হইলে বোধ হয় এত বড়টী হইতে পারিতাম না। কত কষ্টেই না তিনি আমাদের লালন পালন করিয়া থাকেন। শৈশবে যদি সন্তানের শরীর একটু অসুস্থ হয় তাহা হইলে স্নেহময়ী জননী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সন্তানের কল্যাণ কামনার্থে কঠোর ব্রতাদি পালন করেন। আমাদের ইহকাল এবং পরকাল তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত ছিল। মায়ের আদর্শে ও মায়ের যত্নেই সন্তানের চরিত্র গঠিত হয়। মায়ের করুণা বিনা শৈশবে আমরা এক মুহূর্ত্ত জীবন ধারণ করিতে পারিতাম না।

"There is an enduring tenderness in the love of a mother to her son that transcends all other affections of the heart. It is neither to be chilled by selfishness, nor daunted by danger, nor weakened by worthlessness, nor stifled by ingratitude. She will sacrifice every comfort to his convenience. She will surrender every pleasure to his enjoyment; she will glory in his fame, and exalt in his prosperity :—and, if misfortune overtake him, he will be the dearer to her from misfortune, and if disgrace settle upon his name, she will still love and cherish him in spite of his disgrace; and if all the world beside cast him off, she will be all the world to him."

কিন্তু আমরা এতই নীচ এবং ঘৃণ্য যে বড় হইয়া সেই পুণ্যময়ী স্নেহশীলা জননীর কথা একেবারেই ভুলিয়া যাই। তখন যদি তিনি কোন উপদেশ দিতে যান তাহা হইলে তাহা বিষবৎ বোধ হইতে থাকে এবং তখন সেই করুণাময়ী জননী শৈশবে যাহার অমৃতোপম স্তনপান করিয়া এত বড়টী হইয়াছি তিনি যেন চক্ষুঃশূল হইয়া উঠেন। তখন তাঁহার প্রত্যেক কথা বিষবৎ বোধ হইতে থাকে। আজকালকার অধিকাংশ ছেলেরাই বড় হইয়া মাতৃস্নেহ বলিয়া যে কোন বস্তু এ জগতে আছে তাহা ভুলিয়া যায়। পুত্রের উন্নতি মায়ের করুণার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মায়ের আশীর্ব্বাদ দেবতার আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এ মরজগতে মাতাই আমাদের দেবতা স্বরূপিনী। আমরা যদি কায়মন-বাক্যে তাঁহার চরণ সেবা করিতে পারি তাহা হইলেই আমরা ধন্য। সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপিনী এই মাতার প্রতি সর্ব্বদা সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যাহারা মাতাকে অনাদর ও অবজ্ঞা করে তাহারা জীবনে কখনই সুখী হইতে পারে না। এ জগতে যাঁহারা চিরস্মরণীয় হইয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। কিন্তু আজকালকার অধিকাংশ ছেলেরাই মাকে ভক্তি করা দূরে থাকুক প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। যে মাতার সহিত এরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করে সে পশু অপেক্ষা নীচাশয়। পশুর হৃদয়েও মায়ের প্রতি ভালবাসা আছে কিন্তু ইহাদের হৃদয়ে তাহাও নাই। ব্যাঘ্র, সিংহ, মহিষ, ইত্যাদি হিংস্র বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু আজ কাল জানিনা কোন্ শিক্ষার প্রভাবে এক শ্রেণীর নূতন জীব সৃষ্ট হইয়াছে যাহারা পশু অপেক্ষা নীচ, যাহাদের স্বভাব পশু অপেক্ষা ঘৃণ্য, যাহাদের হৃদয়ে সহানুভূতির লেশ মাত্র নাই। আজকাল ছেলেরা যতই লেখাপড়া শিখিয়া সভ্যতার উচ্চ শিখরে উপনীত হইতে থাকে ততই তাহাদের স্বভাব পশু অপেক্ষা নীচ হইতে থাকে। তথাকথিত শিক্ষিত অপেক্ষা জননীর একটী মূর্খ পুত্রও ভাল। সে দুই বেলা মায়ের চরণ পূজা করে কারণ সে জানে মাতার আশীর্ব্বাদ ভিন্ন তাহার এ জগতে আর কিছুই নাই। আমরা যদি পুরাকালের ইতিবৃত্ত আলোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে তখনকার প্রত্যেকেই মাতাকে যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন তাহার ফলে তাঁহারা কত সুখী হইতেন এবং মনে অপার আনন্দ উপভোগ

করিতেন ; প্রাতে মায়ের চরণ বন্দনা না করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইতেন না। কিন্তু আজকালকার ছেলেদের ভিতর ঐরূপ মাতৃভক্তির নিতান্তই অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ইহ সংসারে উন্নতিলাভ করিতে বাসনা থাকিলে মাতার বাধ্য হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক অধ্যয়ন, গৃহকর্ম্ম প্রভৃতিতে সর্ব্বদাই নিযুক্ত হওয়া উচিত। তাঁহার প্রতি ভক্তি ও আস্থা স্থাপন করিয়া কার্য্য করিলে অতি অল্প দিনের মধ্যে উন্নতিলাভ করিয়া দশের ও দেশের শ্রদ্ধা ভাজন বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ১ম শ্রেণী।

হজরত মহম্মদ [দঃ]

——[*]——

যিনি সত্য ও সনাতন ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া অসাধারণ অধ্যবসায় বলে ও কঠোর সাধনায় শত সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতঃ স্বীয় মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের তেজে মনুষ্যগণের ভ্রম ও কুসংস্কার ভস্মীভূত হইয়া একেশ্বরোপাসনার নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সেই ইস্‌লাম প্রবর্ত্তক মহাত্মা হজরত মহম্মদ (দঃ)—৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে আগষ্ট—রবিয়ল আউয়াল মাসের দ্বাদশ দিবসে সোমবার পাপপুরী সদৃশ আরব মরুর অন্তর্গত 'মক্কা' নগরে সুবিখ্যাত কোরেশ কুলপতি আবদুল মত্তালেবের পুত্র আবদুল্যার ঔরষে 'আমেনা খাতুনে'র উদরে জন্মগ্রহণ করেন। নবকুমার অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবা মাত্রই দেখা গিয়াছিল যে, তাঁহার ত্বকচ্ছেদ হইয়াছে ও স্কন্ধদেশে মোহরণবুয়ত—প্রেরিতত্বসূচক মোহর-ছাপ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। এ হেন পুত্ররত্নের—সুন্দর সহাস্য আস্য আমেনা দেবী নবপরিণীত পতির অকাল মৃত্যুজনিত শোকে কথঞ্চিত শান্তি আনয়ন ক[illegible]

জন্মের অষ্টম দিবসে বংশের চিরন্তন প্রথানুসারে হজরত মহম্মদ স্বীয় খুল্লতাত আবুলহবের দাসী সওবার নিকট অর্পিত হন। পরে সময় ও সুযোগ মত সাদবংশীয় আবদুল ওজ্জার পুত্র হারেসের পত্নী হালিমার নিকট অর্পিত হন। এইরূপে তিনি ধাত্রীমাতার সহিত তাঁহারই বাসস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক ধাত্রীমাতা ও তাহার সন্তান প্রভৃতির সহিত প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদাই তাহাদের সম্মান রক্ষার্থ যত্নবান ছিলেন। হালিমা ছয় মাস অন্তর এক একবার কুমারকে দেখাইবার জন্য মক্কায় আমেনার নিকট আনয়ন করিত। দুই বৎসর বয়ঃক্রমকালে হজরত মহম্মদ স্তন্যপান ত্যাগ করিলে হালিমা তাঁহাকে আমেনার নিকট আনিয়াছিল। কুমারকে সরল ও সুস্থকায় দেখিয়া আমেনা স্বয়ং তাঁহার ভার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মক্কার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর হওয়াতে আমেনা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে হালিমার নিকট অর্পণ করেন। তদনন্তর চারি বৎসর বয়ঃক্রমকালে আমেনা স্বহস্তে তাঁহার লালন পালন ভার গ্রহণ করেন।

হজরত মহম্মদের ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মাতা আমেনা তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া মদিনায় আদিব জাতীয় এক আত্মীয়ের গৃহে গিয়াছিলেন। কিছুকাল তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যে আবু-আবওয়া নামক স্থানে কাল কবলিতা হন। সেখানে তাঁহার শবদেহ সমাহিত করা হয়। তদনন্তর মাতার সহধর্ম্মিণী ওম্মে এয়মনের সহিত মদিনায় প্রত্যাগমন করতঃ দুই বৎসর কাল বৃদ্ধ পিতামহ আবদুল মোত্তালেব কর্ত্তৃক পরম যত্নে ও সমাদরে প্রতিপালিত হন। কিন্তু সে যত্ন অধিক কাল তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। যখন হজরতের বয়স আট বৎসর, তখন আবদুল মোত্তালেব বয়াধিক্যবশতঃ মৃত্যু নিকট জানিয়া পুত্রগণকে হজরতের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ও আবদুল্লার সহোদর ভ্রাতা আবুতালেবের হস্তে কুমারের ভার সমর্পণ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। মহানুভব আবুতালেবও পিতার শেষ উপদেশানুসারে ভ্রাতুষ্পুত্রকে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

হজরত মহম্মদ বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে স্বপ্নাবস্থায় স্বর্গীয় আদেশ শ্রবণ করিতে থাকেন। স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণে আবুতালেব চিন্তিত হন, কিন্তু একজন বিশিষ্ট দৈবজ্ঞের উপদেশে সে চিন্তা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে নাই। একবিংশতি বৎসর বয়সে

মক্কার সন্নিহিত 'পহিয়া' পর্ব্বতে পশুচারণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যৎসামান্য অর্থোপার্জ্জন দ্বারা পিতৃব্য আবুতালেবের কষ্টের কথঞ্চিৎ লাঘব করেন।

মক্কাবাসী পরলোকগত খোয়ায়েলেদের বিধবা কন্যা খাদিজা অতুল বিভবশালিনী অনুপম রূপলাবণ্যবতী ও অশেষ সদ্‌গুণশালিনী যুবতী ছিলেন। একদা তিনি স্বপ্নে আকাশ হইতে চন্দ্রমাকে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অঙ্কে ধারণ করিতে ও তাঁহার জ্যোতিঃ তাঁহার পার্শ্বদেশ দিয়া বহির্গত হইতে দেখিয়া ভাবী পয়গম্বরের সহিত সম্মিলন অবশ্যম্ভাবী জানিয়া হজরতের সহিত বিবাহের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে হজরত মহম্মদ খাদিজার কার্য্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া তাহার স্থল বণিকগণকে লইয়া সুরিয়ায় বাণিজ্যার্থে গমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে সার্থবাহগণ যাত্রা করিল। পথিমধ্যে পণ্যদ্রব্যের ভারপ্রাপ্ত ও খাদিজার ক্রীতদাস 'মায়শারা' খাদিজার আদেশানুসারে হজরতকে একটি বহুমূল্য পরিচ্ছদ দিয়া অশেষবিধ সম্মান ও যত্ন করিতে লাগিলেন, যাহাতে আবুজহল প্রভৃতি নীচাশয় ব্যক্তিগণ ঈর্ষান্বিত হইলেন।

বণিকদলের প্রত্যাবর্ত্তনের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে খাদিজা স্বীয় তুঙ্গ-প্রাসাদোপরি আরোহণ করতঃ দেখেন যে, প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণ হইতে হজরতকে রক্ষা করিবার জন্য একখণ্ড মেঘ ও একটি পক্ষী পক্ষ বিস্তার করতঃ তাঁহাকে ছায়াদান করিতেছে। হজরত উপনীত হইলে খাদিজা তাঁহাকে সাদরে ও সসম্মানে গ্রহণ করিয়া মায়সারার নিকট ইহুদীদের ভবিষ্যৎবাণী শ্রবণ করতঃ দেখেন যে, এবার বাণিজ্যে তাঁহার তিনগুণ লাভ হইয়াছে। এক্ষণে বুদ্ধিমতী খাদিজা হজরতকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যাকুলা হইয়া নফিসা নাম্নী সহচরীকে আপনাভিলাষ জ্ঞাপনার্থ হজরতের নিকট প্রেরণ করেন। হজরত স্বীয় দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করিয়া প্রথমতঃ বিবাহে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু খাদিজা বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃতা হওয়ায় পিতৃব্যের আদেশানুসারে শুভ দিনে শুভক্ষণে খাদিজার পাণিপীড়ন করিলেন। বিবাহের পর খাদিজা স্বীয় ধনভাণ্ডারাদি হজরতের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহারই সেবায় নিযুক্তা হইলেন। হজরতও সেই অপরিমিত ধনরাশি অকাতরে দান করিয়া রিক্তহস্ত হইতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

হজরত মহম্মদ প্রেরিতত্বলাভের পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে পথে, ঘাটে, মাঠে গমনাগমন কালে সর্ব্বদাই "হে মহম্মদ" শব্দটি শুনিতে পাইতেন। প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইবার সাত বৎসর পূর্ব্বে তিনি সময় সময় গগনমণ্ডলে আলোকরাশি দেখিতে পাইতেন। অহোরাত্র কেবল নির্জ্জনে ঈশ্বরধ্যানে নিযুক্ত থাকিতে অভিলাষ করতঃ চত্বারিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মক্কার তিন মাইল উত্তরস্থিত 'হেরা' গিরি গহ্বরে গিয়া আল্লার ধ্যানে নিরত হন। হেরার নিভৃত গুহায় "জিব্রাইল" (আলাঃ) কখন মানুষের আকারে কখন বা পক্ষযুক্ত স্বর্গীয় দূতের আকৃতিতে হজরতের নিকট প্রত্যাদেশ সমূহ আনয়ন করিতেন। একদা ২৭শে 'রমজান' তারিখে 'জেব্রাইল' (আলাঃ) আল্লাহো তায়ালার আদেশ লইয়া 'হেরা-গহ্বরে' হজরতেয় নিকট উপনীত হইয়া বলেন—'হে মহম্মদ!' আল্লাহো তায়ালা আমাকে পাঠাইয়াছেন, তুমি তাঁহার নিয়োজিত ধর্ম্মপ্রচারক এবং আমি তাঁহার দূত 'রুহল-আমিন্' (জেব্রাইল)। পরে জেব্রাইল (আলাঃ) এলাহির গুণগান পূর্ব্বক হজরতকে অজু (উপসনার্থ পবিত্র হওন) ও নামাজ (উপাসনা)র পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন। ইহা হজরতের একচল্লিশ বর্ষ বয়সে সংঘটিত হইয়াছিল এবং এই রজনীকে 'লয়লাতোল-কদর' অর্থাৎ সম্মানের রজনী বলে; এই সময় হইতে তাঁহার নিকট কোরাণ সরীফের (আয়ত) শ্লোক অবতীর্ণ হইতে থাকে।

"ধর্ম্ম প্রচার ও একমাত্র রহিম-রহমান-এলাহির গুণকীর্ত্তন কর', এই প্রত্যাদেশে তিনি আত্মীয়দের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইলেন। খাদিজা সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মগ্রহণ করতঃ তদনুযায়ী কার্য্য করিতে থাকেন। ইহার অব্যবহিত পরে আবুতালেবের পুত্র আলি (করঃ) এই পুনঃ প্রচারিত ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। আবুতালেব জানিতে পারিয়া উভয়কে ডাকিলেন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্য দর্শনে জীবিতকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। আরব দেশের বিশেষ বিচক্ষণ ও সম্মানার্হ আবুবকর ও 'কফ' পল্লীস্থ 'বোহায়রা' সন্ন্যাসীর উপদেশানুসারে বৃদ্ধ বয়সে ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক ইহার বহুল প্রচার করেন এবং ওসমান প্রভৃতি পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

কোরেশগণ যখন জানিতে পারিল যে ইস্‌লাম ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য—অসার পৌত্তলিকতা ধ্বংস করা—তখন এই নবপ্রচারিত ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত মুসলমানদের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে আবুসুফিয়ান, আবুলহব, আবুজহল প্রভৃতি প্রধান। হজরতের ধর্ম্ম-প্রচারের চতুর্থ বর্ষে তিনি কোরেশগণকে 'সাফা' পর্ব্বতোপরি আহ্বান করিয়া একমাত্র এলাহির উপাসনা করিতে আদেশ দেন। কোরেশগণ তাঁহার উপদেশ গ্রহণ না করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হয়। কিছুদিন পরে হজরত 'জেব্রাইল' (আলাঃ)র উপদেশানুসারে আলি কারা সমস্ত কোরেশ গণকে তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। আহারান্তে তিনি বলেন—"একমাত্র আল্লাহো তায়ালা ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই, তিনি আমাকে সমুদায় লোকের নিকট সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতে পাঠাইয়াছেন। সকলেই পরিণামে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে"। একমাত্র আলি ব্যতীত সকলেই তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিল। তখন তিনি পুনরায় বলিলেন হে লোক সকল! আমার মন্ত্রদাতা ভ্রাতা ও প্রতিনিধিকে দর্শন করুন। সকলেই ইহার উপদেশানুসারে কার্য্য করিবেন। কোরেশগণ আলি ও তদীয় পিতা 'আবুতালেব'কে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। আবুতালেবও সেই প্রকাশ্য সভায় হজরতকে রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন।

প্রেরিত্বলাভের পর হইতে শত্রুগণ হজরতকে নানারূপে উপহাস ও বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করে। কেহ কেহ তাঁহাকে পাগল মনে করিত। কেহ বা বলিত যে উহাকে ভূতে পাইয়াছে। আবার কেহ বা তাঁহাকে 'যাদুকর' আখ্যা প্রদান করিত। এমন কি কাবার উপাসনা কালে তাঁহার গাত্রে মলমূত্রাদি নিক্ষেপ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। হজরত তাহাদিগকে এই মাত্র বলিতেন,—"এই কি প্রাতবাসীর উপযুক্ত কর্ম্ম ?"

কোরেশগণ কোনরূপেই হজরতকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া আবুতালেবের নিকট অভিযোগ করিল। আবুতালেব তাঁহার অসম সাহসিকতা ও ধর্ম্মানুরক্তি দর্শন করিয়া সাধ্যানুসারে তাঁহাকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন এবং সমস্ত আত্মীয়দিগকে ডাকিয়া হজরতের সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু হাসেম ও আবদুল মোত্তালেবের বংশধরগণ ভিন্ন অন্য সকলেই তাঁহার উপদেশ ও অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল।

একদা 'সাফা' পর্ব্বতোপরি পূজার সুযোগে হজরত একেশ্বরবাদ প্রচার করায় আবুজহল প্রভৃতি দুরাত্মারা প্রস্তর নিক্ষেপে তাঁহাকে আহত করে। হজরতের মনয়াগত পিতৃব্য 'হামজা' এই সংবাদে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া আবুজহলের মস্তক চূর্ণ করতঃ হজরতের নিকট উপনীত হইয়া সেই সংবাদ দিলেন। হজরত তাঁহাকে ইস্লাম ধর্ম্মের স্থূলমর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া উক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলায়, 'হাম্জা' মুসলমান হইলেন। ইনিই শেষে ইস্লাম ধর্ম্ম-সংরক্ষণে একজন বিখ্যাত সাহায্যকারী বলিয়া পরিগণিত হন।

অন্য কোন এক সময় আরবের তদানীন্তন স্বনামধন্য বীর 'ওমর' কোরেশগণের নিকট হইতে পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় হজরতের বধসাধনার্থ যাত্রা করিয়া পথে তাঁহার ভগিনী ও ভগিনীপতির ইস্লাম-ধর্ম্মাবলম্বনের কথা শুনিয়া তথায় উপস্থিত হন এবং তাঁহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার সত্ত্বেও তাহারা অবিচলিতচিত্তে সর্ব্বনিয়ন্তা আল্লাহো তায়ালায় আত্মসমর্পণ করিয়া রহিলেন। কিছুতেই তাহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসকে টলাইতে পারিলেন না। বরং তাহারা সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অপমান ও লাঞ্ছনা সত্ত্বেও পবিত্র 'কোরাণ' পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহার ভগিনীপতি সয়িদ পাঠ করিলেন—"আল্লাহো তায়ালা স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই সকলের অধীশ্বর, তিনি ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই। মানবগণ যাহা করে, তিনি তাহা অবগত হন।" অতঃপর যখন মৃত্যুর পর পুনর্ব্বিচারের কথা পড়িলেন, তখন সেই পাষণ্ড ওমরের অন্তরও ধর্ম্মভাবে বিগলিত হওয়ায় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"লাএ লাহা ইল্লা আল্লাহো মহম্মাদর রাছুল আল্লাহে" অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই এবং হজরত মহম্মদ তাঁহারই প্রেরিত। পরদিবস প্রাতে ওমর হজরতের নিকট উপনীত হইয়া কৃতাপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষান্তর ইস্লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। আবুবকর (রাঃ)র মৃত্যুর পর ইনি 'খলিফা' পদারূঢ় হইয়া আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশে ইস্লামের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করেন। ওমরের দীক্ষা গ্রহণে হজরতের ৪০ চল্লিশ জন তালেব (শিষ্য) পূর্ণ হয়। (ক্রমশঃ)

আছির উদ্দিন আহম্মদ, ১ম শ্রেণী।

পুর্ণিমার চাঁদ।

আহা কি ! আশ্চর্য্য হেরি পূর্ণিমার শশী।
হাসিতেছে পূর্বাকাশে অপরূপ হাসি ॥
যতই চাহিয়া দেখি, হেরি চমৎকার।
না পারি ফিরাতে আঁখি সৌন্দর্য্যে তাহার ॥
ঢল ঢল করি যেন উঠিছে উপরে।
পড়েছে তাহার ছবি জলের ভিতরে ॥
কে যেন জ্বেলেছে আলো আকাশের গায়।
হয়েছে পৃথিবী আলো তাহার ছটায় ॥
কে দিয়াছে তব আস্যে এ মধুর হাসি।
জানিতে বাসনা তাই তোমারে জিজ্ঞাসি ॥
বুঝেছি তোমায় হাসি দিয়াছেন যিনি।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অধিকারী তিনি ॥

শ্রীঅমূল্যকুমার হুই, ৪র্থ শ্রেণী

বৈদ্যনাথ ভ্রমণ।

——[*]——

অনেক দিন হইতে আমি বৈদ্যনাথ দর্শনের মানস করিয়াছিলাম। বৈদ্যনাথ হিন্দু-দিগের একটি তীর্থস্থান। প্রথমে আমরা খুলনা হইতে রওয়ানা হইয়া কলিকাতায় গিয়াছিলাম। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করিয়া শারদীয়া পূজার দিন বেলা ১২টার সময় তৈজষপত্র বন্ধন করিয়া মাতাপিতার সহিত বৈদ্যনাথ দর্শনের জন্য দিল্লী এক্সপ্রেসে চড়িয়া যাত্রা করিলাম। সমস্ত দিন চারিদিকের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। সূর্য্যের তেজ যতই কমিতেছিল ততই যেন চতুর্দ্দিকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইতেছিল। ক্রমে অল্প অল্প করিয়া দিবার শেষ আলোকচ্ছটা টুকু দেখা দিয়া পৃথিবীর গহ্বরে বিলীন হইলেন, এবং পরে সন্ধ্যাদেবী আস্তে আস্তে পৃথিবীর উপর সন্ধ্যার আঁচল ছড়াইয়া দিয়া আগমন করিলেন। তখন ঝিল্লিগণ ঝিঁ ঝিঁ রব করিয়া সন্ধ্যার আগমনবার্ত্তা সকলকে জানাইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় আমাদের গাড়ী জশিডি ষ্টেশনে আসিয়া থামিল এবং আমরা গাড়ী হইতে নামিলাম। পরে আমরা এই গাড়ী বদল করিয়া বৈদ্যনাথের গাড়ীতে উঠিলাম ও বৈদ্যনাথ-ধামাভিমুখে রওনা হইলাম। গাড়ী আস্তে আস্তে গমন করিয়া রাত্রি ৮টার সময় বৈদ্যনাথ ধামে আসিয়া পৌঁছিল। সেই দিন আমরাই কেবল বৈদ্যনাথ যাত্রী, আর কেহ নাই। আমাদের গাড়ীর কামরা ভিন্ন আর সমস্তই শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম।

সেই সময় পাণ্ডারা আসিয়া আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিতে লাগিলেন "আপনারা আমাদের বাড়ীতে চলুন।" আমরা বলিলাম, "না আমরা কাশীপ্রসাদ পাণ্ডার বাড়ী যাইব।" পাণ্ডাদের মধ্যে একজন বলিলেন "কাশীপ্রসাদ বাড়ীতে নাই।" কিন্তু আমরা তাঁহাদের কথা না শুনিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া "কাশী-প্রসাদের" বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম। পথিমধ্যে কাশীপ্রসাদের সহিত দেখা হইল।

তিনি আমাদিগকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং বাড়ীতে পৌঁছিয়া আমি তাঁহার সহিত মন্দিরের নিকটস্থ দোকান হইতে কিছু মিষ্টান্ন আনিয়া তখনকার মত উদর শান্ত করিলাম।

আমরা তিনদিন পাণ্ডার বাড়ী থাকিয়া তৎপর টাউনে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে গেলাম। সেই বাড়ীতে বাড়ীওয়ালার ভগ্নী ও তাঁহার পুত্র থাকিতেন।

বৈদ্যনাথের উত্তরে নন্দন পাহাড়, দক্ষিণে চোল পাহাড়, পূর্ব্বে তপোবন পাহাড় ও ত্রিকূট পাহাড়, পশ্চিমে দিগ্‌রিয়া পাহাড়। আমাদের বাড়ীর দক্ষিণে পূর্ব্ববাহিণী যমুনা কুল কুল রবে বহিয়া যাইতেছে। তাহাতে হাটু পর্য্যন্ত জল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য আছে।

একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে নন্দন পাহাড় দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া দেখি তাহার উপর একটী শিবমন্দির আছে। সেই মন্দিরের ভিতরে একজন সাধু বসিয়া ঠাকুরের পূজা করিতেছেন। আমি ঠাকুরকে একটী পয়সা দিয়া একটু চরণামৃত খাইয়াছিলাম।

বৈদ্যনাথে ৫২ বিঘা জমিতে যে একটী শিবমন্দির আছে তাহা দেখিয়াছিলাম। বৈদ্যনাথে সাধু বালানন্দ স্বামী আছেন। তাঁহার দুইটী আশ্রম আছে। একটী করণী-বাগে আর একটী তপোবন পাহাড়ে। একদিন আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম এবং সেখানে গিয়া দেখিলাম যে তিনি অন্যান্য লোকদের সহিত গল্প করিতেছেন। সেখানে তাঁহার অনেক শিষ্য আছেন। তন্মধ্যে পূর্ণানন্দ স্বামী প্রধান। শিষ্যদিগের মধ্যে সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত আছেন। কেহ কেহ গীতা বা উপনিষদ পাঠ করিতে-ছেন, কেহ কেহ বা ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিতেছেন। আর কেহ বা ধ্যান করিতেছেন। এ দৃশ্য অতি পবিত্র।

একদিন রাবণেশ্বর বৈদ্যনাথের পূজা দিতে গিয়াছিলাম। মন্দিরে গিয়া দেখি বৈদ্যনাথ ঠাকুর পাতালে অন্ধকারের ভিতর রহিয়াছেন। কথিত আছে—"যখন শ্রীরামচন্দ্রের সহিত রাবণের যুদ্ধ হয় তখন রাবণ শ্রীরামচন্দ্রকে পরাজিত করিবার জন্য

মহাদেবের আরাধনা করেন। তখন মহাদেব আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া রাবণের নিকট আগমন করিলেন এবং বলিলেন "আমি তোমার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি কি বর চাও, বল।" রাবণ বলিলেন আমি আপনাকে লঙ্কায় লইয়া যাইতে চাই।" তখন মহাদেব বলিলেন, "যদি তুমি আমাকে কাঁধে করিয়া লঙ্কায় লইয়া যাও তাহা হইলে আমি লঙ্কায় যাইব, আর যদি পথিমধ্যে কোন স্থানে আমাকে নামাইয়া রাখ তাহা হইলে আমি আর সেখান হইতে কিছুতেই উঠিব না।" রাবণ তাহাতে রাজি হইয়া তাঁহাকে কাঁধে লইয়া লঙ্কার দিকে চলিলেন। এদিকে দেবতারা ভাবিলেন যে, রাবণ যদি ঠাকুরকে লঙ্কায় লইয়া যায় তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। তখন দেবতারা সকলে পরামর্শ করিয়া বরুণদেবকে তাহার উদরে প্রবেশ করাইলেন।

বরুণদেব উদরে প্রবেশ করার জন্য রাবণের পথ চলিতে চলিতে ভয়ানক প্রস্রাব পাইল। এমন সময় মহামুনি নারদকে সেই পথে আসিতে দেখিয়া, রাবণ তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহার কাঁধে মহাদেবকে রাখিয়া নিজে প্রস্রাব করিতে বসিল। কিন্তু বরুণদেব উদরে প্রবেশ করার জন্য তাহার আর প্রস্রাব শেষ হইল না। ক্রমে তাঁহার প্রস্রাবে একটী নদী প্রবাহিত হইল। তখন এই নদীর নাম হইল "কর্ম্মনাশা"। এই নদী বৈদ্যনাথের দক্ষিণে অবস্থিত। এদিকে নারদমুনি রাবণের প্রস্রাব শেষ হইতেছে না দেখিয়া রাগ করিয়া মহাদেবকে মাটীতে নামাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

নারদ মুনি যখন প্রস্থান করিলেন ঠিক সেই সময় রাবণের প্রস্রাব শেষ হইল। তিনি তখন উঠিয়া বলপূর্ব্বক মহাদেবকে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বের কথামত মহাদেব কিছুতেই উঠিলেন না। তখন রাবণ রাগ করিয়া মহাদেবের মাথায় হস্তদ্বারা চাপ দিয়া তাঁহাকে পাতালে ঢুকাইয়া দিলেন। সেই সময় হইতেই মহাদেবের নাম রাবণেশ্বর বৈদ্যনাথ হইল।"

এখানে শিবমন্দিরের নিকট একটি শিবগঙ্গা আছে, শিবগঙ্গার নিকটে একটি ধর্ম্মশালা আছে। এখানে অনেক গরীব বাঙ্গালীরা থাকে ও বিনা মূল্যে আহার করিতে পায়।

একদিন আমি রাবণেশ্বর বৈদ্যনাথের মন্দিরে গিয়া দেখি, স্ত্রী, পুরুষেরা, মন্দিরের নিকটে, পুত্র, কন্যাপ্রাপ্তি ও রোগমুক্তির জন্য ধন্না দিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। বৈদ্যনাথে রাবণেশ্বর বৈদ্যনাথ, জয়দুর্গা, বক্রেশ্বর প্রভৃতি মন্দির আছে। জয়দুর্গার মন্দিরে প্রত্যহ গীতা পাঠ হয়।

কথিত আছে "যখন সতী দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন মহাদেব সতীকে স্কন্ধে করিয়া যে সময় পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন সেই সময় বিষ্ণু, তাঁহার সুদর্শন চক্র দ্বারা পশ্চাৎ হইতে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতেছিলেন। তখন সতীর হৃদয়ের এক অংশ এই বৈদ্যনাথে পড়িয়াছিল, তাই এখানে দেবী জয়দুর্গা, ভৈরব বৈদ্যনাথ আবির্ভূত হইয়াছেন।

একদিন আমি বাড়ীওয়ালার ভাগ্নের সহিত চোল পাহাড় দেখিতে গিয়া পথিপার্শ্বে একটী ঝরণা দেখিয়াছিলাম। চোল পাহাড়ে গিয়া দেখি সেখানে একটী ভগ্ন শিব-মন্দির আছে। আর বেল বৃক্ষের বাগান।

আর একদিন তাঁহার সহিত বৈদ্যনাথের দক্ষিণে রেল লাইনের পার্শ্বে দাড়াইয়া নদীর জল আনিতে গিয়াছিলাম। এই নদী এরূপ আশ্চর্য্য যে বালি খুঁড়িলেই জল পাওয়া যায় এবং এই জল পান করিলে খুব হজম ও ক্ষুধা হয়। সহরের সকল লোকে এই জল পান করে। একদিন সন্ধ্যার সময় ঘরে বসিয়া আছি এমন সময় শুনি বাহিরে চট্‌পট্‌ শব্দ হইতেছে। তখন জানালা দিয়া দেখি যে পাহাড়ে আগুন লাগিয়াছে। ঐ দেশবাসী সাঁওতালেরা বন্যজন্তু মারিবার জন্য পাহাড়ের অরণ্যে আগুন লাগায় ও তাহাতে ঐরূপ শব্দ হয়।

বৈদ্যনাথে রোগ লইয়া গিয়া বৈদ্যনাথ ঠাকুরকে মানসা করিয়া পূজা দিলে রোগ সারিয়া যায়। সেখানে অনেক রোগী যায়। অনেকে বলেন "কুঁড়ের বাতান বৈদ্যনাথ।"

এখানে খুব চোরের ভয়। একদিন আমরা সকলে কপাট বন্ধ করিয়া গল্প করিতেছি এমন সময় একটী জানালা হঠাৎ খুলিয়া গেল। আমরা মনে করিলাম ইহা বাতাসে খুলিয়াছে এবং আমি তখন জানালা বন্ধ করিতে গিয়া দেখি লাল আলোয়ান গায় একটি লোক দৌড়িয়া পলাইয়া গেল।

আমি একদিন প্রাতে বম্পাস টাউনের ফাঁকা মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিলাম তখন সেস্থানে নানা জাতীর বিহঙ্গের কুজনে ও প্রভাত সমীর অতি মনোরম বোধ হইতে লাগিল। আর দুই মাইল হাটিয়া একটী পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। তখন দিবাকর রক্তবর্ণ হইয়া অল্প অল্প করিয়া পূর্ব্ব গগনে উদিত হইতেছিলেন।

তখন উপর হইতে কুলকুল রবে সাদা দুধের মত জল পাহাড় হইতে নীচে ঝরণায় পড়িতেছিল। তখন আমার স্বপ্নবৎ মনে হইতে লাগিল, যেন একখানি নৌকা সাদা পাল তুলিয়া চলিয়াছে এবং মাঝিগণ এই নৌকার ভিতর বসিয়া যেন বীণাস্বরে আনন্দে ভোরের গান গাহিতেছে। এই বৈদ্যনাথ ধাম অতিশয় সুন্দর স্থান। এখানে গেলে আসিতে ইচ্ছা করে না এবং এই স্থানে অনেক দেখিবার বস্তু আছে। এই সমস্ত দেখিলে যথেষ্ট জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ হয়।

শ্রীগৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,
দ্বিতীয় শ্রেণী

নির্ঝর।

(১)

জন্ম তব কোথা কোন্ গিরিপাদমূলে,
গুরু অন্ধকার ভরা গভীর কন্দরে?
যেথা হ'তে আনন্দের শত বাহু তুলে
ছুটিছ মিলিতে ভ্রান্ত সুদূর সাগরে!

(২)

কত শ্যাম ক্ষেত্ররাজি, বিস্তৃত প্রান্তর,
বন্ধুর উজ্জল পথ শোভে পাশে তব,
শিলা' পরে পথশ্রান্ত রাখি আত্মভর,
প্রবাহিত সৌন্দর্য্যের দৃশ্য অভিনব।

(৩)

অপরাহ্নে গিরিতলে নির্জ্জন সে ভূমে,
পর্ব্বতীয় বালা কত আসে চিত্রপ্রায়;
জুড়াইতে তব নীরে সে সৌন্দর্য্য চুমে,
মগ্ন, উচ্চ কল্‌কলে আনন্দে নির্ভয়।

শ্রীসন্তোষকুমার মল্লিক,
প্রথম শ্রেণী।

মূকের উক্তি

(১)

গঙ্গানদী কল্ কল্ শব্দ করিতে করিতে বহিয়া যাইতেছে। তারই পারে একটি গ্রাম। সেখানে থাকে সনাতন গোয়ালা। সনাতনের পরিবারের মধ্যে—এক স্ত্রী, দুই ছেলে এবং এক মেয়ে। বড় ছেলের নাম কৃষ্ণদাস, ছোট ছেলের নাম হরিদাস এবং মেয়ের নাম হেমপ্রভা। সনাতনের অবস্থা খুব ভাল ছিল না। তবে মোটামুটি চল্‌ত'। তার পাঁচখানা জমি ছিল—তা বরগায় আবাদ কর্‌ত ছয়েজুদ্দি সেখ।

সনাতন এবং তার স্ত্রী শেষরাত্রে শয্যাত্যাগ ক'রে, ঘি, মাখন, ছানা, দধি ইত্যাদি প্রস্তুত করে। সনাতন এসব নিয়ে বাজারে যায় এবং বিক্রয় ক'রে যাহা পায় তাই দিয়ে চাল্, ডাল্ প্রভৃতি কিনে আনে। তাদের এইরূপে সংসার চলে। কোন টাকা কড়ির বিশেষ জমা নাই—কেন না, বাড়ন্ত মেয়েটি, ব্রাহ্মণাদির ঘরে হইলে দারুণ চিন্তার বিষয় হইত। গোয়ালার ঘরে পণ লইয়া বিবাহ হইবে।

একদিন সনাতন ও তার স্ত্রী স্থির করিয়াছিল যে তাদের জীবনটা সুখের নয়। এইরূপে দিবারাত্রি খেটে খাওয়া পাপের ফল। সনাতন ছোট বেলায় একবার পাঠ-শালায় গিয়াছিল এবং স্ত্রীর নিকট নিজের প্রশংসা করিত। সে বলিত,—"ছোটকালে আমি খুব ভাল ছেলে ছিলাম এবং আমার ক্লাসের সব ছেলে আমাকে মান্য করিত। কিন্তু আমার লেখাপড়া হইল না।" সনাতনের স্ত্রী বলিত,—"আহা, যদি তুমি লেখা-পড়া শিখ্‌তে তবে কি আর আমাদের এ কষ্ট ক'রতে হয়।" তাই তারা ছেলে দুটিকে শিক্ষা দিবার মনস্থ করিল।

(২)

সনাতন কৃষ্ণদাসকে পাঁচ বৎসরের সময় পাঠশালায় পাঠাইল। তাহারও বাপের মত পাঠশালায় যাওয়ার রোগ পাইয়াছিল। কিন্তু সনাতন জানিত এ রোগ ভাল নয়

ময়ূর ও কোকিল।

ময়ূর কহিল গর্ব্বে কোকিলের প্রতি
"পক্ষী মধ্যে তোর রূপ কদাকার অতি।
দেখ্ না অপূর্ব্ব শোভা অঙ্গেতে আমার
আছে কি এ রূপ পক্ষী অবনী ভিতর?"
কোকিল হাসিয়া বলে "শুনহে ময়ূর
রূপের গরব কেন করহে প্রচুর।
নির্গুণ হইয়া কেন কর রূপ-গান
জান না কি ওহে মূর্খ গুণই প্রধান!"

"দেশবন্ধুর মহাপ্রস্থান"

বাংলার মণি পড়িল খসিয়া, ছিঁড়িল হঠাৎ বীণার তার
নাহি আর সেই সে দেশবন্ধু নাইকো ভারতে আর।
ভারতমাতার বুক হতে আজি কেড়ে নিল এক পুত্র সার৹
কে বুঝিবে আর দেশের দুঃখ কে মুছাবে মায়ের অশ্রুধার
দেশের দুঃখে দশের জন্য কাঁদিবে কাহার হৃদয়-প্রাণ
কে দেখাবে আর আশার আলো গাইবে কে আর মুক্তির গান,
কোথায় চলিলে হে বীরশ্রেষ্ঠ! বাংলা করিয়া অন্ধকার?
দেখ্‌রে জগত, দেখ্‌রে ভারত, সে দেশবন্ধু নাইকো আর।
যাও বীরশ্রেষ্ঠ, তোমার তরেতে আছেগো মুক্ত স্বর্গধাম,
থাকিবে ভারতে তোমার কীর্ত্তি গাহিবে জগৎ তোমার নাম।

শ্রীআশুতোষ বক্সী, দ্বিতীয় শ্রেণী।

—তাই সে লাঠ্যৌষধির সাহায্য লইয়াছিল। এক বৎসর পরে কৃষ্ণদাস সোজা ভাবে চলিতে লাগিল। অনন্তর বিশ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। আজ তার পিতার আনন্দ দেখে কে! সনাতন এখন বড় বিপদে পড়িয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল,—কি করিয়া এখন ছেলেকে কলেজে পড়াইবে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল—সে গ্রামের নিবারণ চৌধুরীর নিকট যাইবে। কিছুক্ষণ পরে সনাতন নিবারণ চৌধুরীর নিকট আসিল এবং তাহার বিপদবার্ত্তা বলিল। নিবারণ বাবু সব শুনিয়া সেদিনই কলিকাতায় রওনা হইলেন। তিনি প্রথমে সিটি কলেজে গেলেন কিন্তু কৃষ্ণ-দাসের কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। পরদিন বঙ্গবাসী কলেজে কৃষ্ণদাসের বিনা বেতনে পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন এবং সুসংবাদটি সনাতনকে বলিলেন। সনাতন আনন্দে গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে আসিয়া গৃহিনীকে ইহা বলিল। গৃহিনী তখনই দু'পয়সার বাতাসা আনিয়া লুট দিল—যাহাতে নিবারণ বাবুর এবং কৃষ্ণদাসের মঙ্গল হয়।

(৩)

দুইটি বৎসর দেখিতে দেখিতে চলিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণদাস এবার এফ, এ দিবে। হরিদাস প্রবেশিকা দিবে। সনাতন এখন একটু বিপদে পড়িল। এই দুই পরীক্ষার ফি যোগাড় করিবার জন্য তাহার মহা ভাবনা হইল। সে অবশেষে উপায় করিতে না দুঃখে বলিতে লাগিল—"হায়, হায়! এতদূর এছেলে দুটোকে পড়িয়ে আর পড়াতে পারলেম না।"

হরিদাস পিতার দুঃখ দেখিয়া বলিল—"বাবা, আমি না হয় পরীক্ষা এবার নাই দিলাম, আমার এখনও মানুষ হইতে দেরি আছে, দাদার পাছে খরচ ক'রলেই কাজ ভাল হ'বে।

পরদিন সনাতন ভোরে ঘুম হইতে উঠিয়াই টাকার জোগাড়ে বাহির হইল এবং বেলা ২টার সময় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণদাসের হাতে ফি'র টাকা দিল—তার তিনখানি জমি জাফর আলি মিঞার কাছে বাঁধা পড়িল।

(৪)

কৃষ্ণদাস পাশ করিল। পিতামাতা সবাই সুখী হইল। এবার তার বি, এ পড়িতে হইবে। কতক বইর দাম নিবারণ বাবু দিলেন। আর কতক সে যোগাড় করিয়া লইল। আর অতি কষ্টে একটি টিউসনি ('Tuitioni) খুঁজিয়া লইল। তাতে সে ২৫৲ টাকা পাইত। সে মেছের ছেলেদের মত বাবুগিরি করিত, নব্য আদব কায়দায় চলিত। এইরূপে সে তার জীবন চালিত করিতে লাগিল। এদিকে হরিদাস পড়িতে লাগিল। কৃষ্ণদাসের এফ, এ পাশের পর বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিল কিন্তু সে তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ "ফেল" হইল। তার ফি বাবদ অপর দু'খানি জমিও জাফর আলির নিকট বাঁধা পড়িল। হরিদাস অকৃতকার্য্য হইয়া অনেক হাটাহাটি ও ঘোরাঘুরির পর একটা রাইটার কনষ্টেবলের চাকুরী জোগাড় করিল। সে তার পিতামাতাকে ৭৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। এইরূপে সনাতনের দিন চলিতে লাগিল। আর সনাতনের সে সামর্থ্য নাই। এখন জ্বরা আসিয়া তাহাকে মৃত্যুর দ্বারে আকর্ষণ করিতে লাগিল। যে বৎসর কৃষ্ণদাস ভ্রাতৃলব্ধ অর্থের সাহায্যে বি, এ পরীক্ষা দিল। সে যেদিন বি, এ পরীক্ষা দিয়া বাড়ীতে আসিল, সেদিন সে তার পিতার আসন্ন অবস্থা দেখিল। কিন্তু মানুষ যাহা পারে না, কৃষ্ণদাস কি তাহাই পারিবে! সনাতন পার্থিব জগত পরিত্যাগ করিল। ছেলেদের মানুষ করিবার জন্যই সনাতন তার পরিবারবর্গকে অকুলে ভাসাইয়া প্রাণ হারাইল। কৃষ্ণদাস সময় মত বাপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
দ্বিতীয় শ্রেণী।

প্রতিশোধ।

(১)

কি হে ভটচায্! বাড়ী আছ? ওঃ ভটচায্?

কে? মজুমদার ভায়া নাকি? এস! এস! বস, বলিতে বলিতে শ্বেতশ্মশ্রু, শ্বেতগুম্ফ, শ্বেতকেশযুক্ত জনৈক লোক বাহিরে আসিলেন। তাহার মাথায় মস্ত টিকি; তাহাতে একটা রক্তজবা বাঁধা। বামহস্তে নস্যের কোটা, দক্ষিণ হস্তে তালবৃন্ত। উদরটি স্থূল নিজেও বটেন (?) ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে রকম্পিত, চেয়ারের পরে উপবেশন করিলেন। চেয়ার মশাই যেন তাহার সেই দেহের গুরুভার বহনে অক্ষম হইয়া ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দে তাহার আবেদন জানাইল; কিন্তু জা'নালে কি হয়? ভটচায্ মশাই আর একটু "সজুত" হইয়া বসিলেন। চেয়ার, সেই ব্যবহারে যেন ক্ষুণ্ণ হইয়া নিস্তব্ধ হইল। "কি মনে করে?"

আর ভাই মনে? এলাম! একলাটি বসে বসে আর ভাল লাগে না, তাই। আছ কেমন?

ভটচায্ মশাই দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে বলিলেন; "আর ভাই থাকাথাকি; গরমের চোটে মারা যাবার যো। বোস! এখনুও দাড়িয়ে?"

ওঃ ঠিক ত? মজুমদার মহাশয়ের বর্ণনাটি হয় নি? মজুমদার একটি ভটচায্ গোছের লোক বটেন, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ ও কেশবিহীন। শরীরটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট। মুখে হাসি আনিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ ভাই বসব নাত কি?" বল্লেও বসব্ব না বল্লেও,"— এই পর্য্যন্ত বলিয়া উপবেশন পূর্ব্বক আরামপ্রদ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ বলিলেন,—"বসব" "টামাক টামাক কিছু খাও।"

"খাচ্ছি"—"উৎসবা! উৎসবা!!"

উৎসবা বাড়ীর ভিতর ছিল ; প্রভুর হাঁক শুনিয়া দ্রুত প্রভু সকাশে আগমন করতঃ দ্বার সমীপে উপস্থিত হইয়া আস্তে একটু "আজ্ঞে" বলিয়া দাঁড়াইল।

"তামাকু লে আও !"

সে ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটু পরে বাঁধান হুকার মাথায় জ্বলন্ত অগ্নিসংযুক্ত কলিকা লইয়া আসিল।

"খাও হে মজুমদার !" বলিয়া ভটচায্ হুকাটি তাহার হাতে দিলেন।

বৃদ্ধ কয়েকটি 'শুকটান' দিয়া বলিলেন নাও ত ভট্চায! ভটচায্ একটু ধূমুদ্গীরণ করিয়া হুকাটী "উৎসবা'র হাতে দিলেন। সে চলিয়া গেল। উৎসবা বাটীর উড়িয়া ভৃত্য।

তাত ? সেদিন শুনলাম, তারকের ছেলেটী কালাপাণি পার হয়েছে ; গিরীশ বিত্তেনিধি বল্লে ওর বাড়ীতে আর পাত পেত না। তোমার কি মত ভট্চায ; গিয়েছে গিয়েছে তার ছেলে গিয়েছে ; সেত আর যায় নি ; তবে কেন ? ওকি দোষ করেছে ?————। "থাক ও সব এস একটু দাবা টাবা হোক।"

"আচ্ছা।"

ভটচায্ চক ও ঘুটী আনিতে গেলেন ও কিছুক্ষণ পরে দাবার পুটুলী লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তার পর চক পাতিয়া খেলা আরম্ভ হইল। দু'জনেই সমান ওস্তাদ ; কেউ কাকে হারাতে পারে না। অনেক্ষণ পরে অনেক কষ্টে ভটচাযের একটী গুটী মারিয়া মজুমদার সোল্লাসে নানা প্রকার বাজে বকিতে লাগিলেন।

"তুমি ভারী বক ?"

মজুমদার হাসিয়া বলিলেন "হ্যাঁ ভাই ঐটী আমার ভারী মুদ্রাদোষ।"

"সাম্লাও গুটী" বলিতে যেন মজুমদার বহিঃপ্রাঙ্গন ফাটাইয়া ফেলিলেন। ভটচায্ মশায় কয়েকটী গুটী হারাইয়া কৌটা হইতে নস্য লইতেছিলেন, বল্লে—"গাধার মত চেচাও কেন ? মাৎ করবে কর।"

গাধা আখ্যায় আখ্যাত হইয়া মজুমদারের যেন ক্রোধ হইল, তিনি গুম্ হইয়া খেলিতে লাগিলেন। খেলায় মন বসিতে চাহিতেছিল না তবুও খেলতে হবে।

"এই কিস্তী" বলিয়া ভটচায সটিকি মাথা দোলাইতে লাগিলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ ইত্যাদি ও আস্তে আস্তে বলিতে লাগিবেন, 'এই কিস্তী, এই কিস্তী———'।

মজুমদার এতক্ষণ বুদ্ধি যোগাইতেছিলেন ! এই স্বস্তি বলিয়া কেশহীন মস্তক একটু দোলাইলেন। অবশ্য কার্য্যগুলি আস্তে সমাধা হইয়াছিল।

"কেমন করে ? কেমন করে ?" বলিয়া ভট্চায্ যেন লাফাইয়া টিকি দোলাইয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন। মজুমদার এইবার চেঁচাইয়া বলিলেন "কেমন করে না ?"

অ্যা ! আবার চেঁচাও ! ফের চেঁচালে ঘা—ড় ধরে বে'র করে দেব।

"কা" বলিয়া মজুমদার গুটী ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন—বলিলেন—"ফল পরে"

বিকৃত স্বরে "আচ্ছা" বলিয়া ভট্চায্ গুটী থলেতে পুর্তে লাগলেন।

(২)

পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু ইহাদের মনোমালিন্য ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছে। সামান্য খুঁটিনাটী বিষয় লইয়া প্রায়ই ঝগড়াঝাটী হয়। শেষে এমন কি মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হইল। কাহারও মনে শান্তি নাই উভয়ে ভাবেন কিসে কার সর্ব্বনাশ হইবে। ভট্চাজের ইচ্ছা যে কোন প্রকারে জব্দ করা ; মজুমদারের ইচ্ছা সদুপায়ে জব্দ করা।

একখণ্ড জমী লইয়া শেষে জমীদারের সঙ্গে ভট্চার্য্যের মামলা আরম্ভ হইল। ভট্চায্ সেই জমী টুকুর জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন, শেষে সমস্ত নগদ টাকা ফুরাইয়া গেল। কেহ টাকা কর্জ্জ দিতে চায় না। মোকদ্দমার পূর্ব্বে যিনি পাঁচ দশ হাজার টাকা কর্জ্জ দিতে পারিতেন এখন তিনিই টাকার জন্য পরের দ্বারস্থ। তিনি টাকার জন্য ভাবিত হইলেন, "কি করি ! উপায় কি? কেহই ত টাকা কর্জ্জ দিতে স্বীকৃত হয় না।" একবার মনে ভাবিলেন মজুমদারের কাছে যাই ; "সে ছেলে বেলাকার বন্ধু ; অসময়ে সামান্য বিষয়ের জন্য বোধ হয় সে ঠেলে ফেলবে না।" ভাবিতে ভাবিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। একটু শান্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন একদিন তা'কে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছিলেম,—তবু যাই, এখন আর মান অপ-

মান। যদি সমস্ত বিষয়টুকু বাঁধা রেখে পাঁচ হাজার টাকা পেতেম—! হায় কি করি ?—এইরূপ মনোমধ্যে চিন্তা করিতে করিতে একেবারে মজুমদার বলিয়া হাঁক !—অবশ্য তাহার বাটীর উপর গিয়ে। মজুমদার তামাক টানিতে টানিতে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—"ভট্‌চায্‌" (?) দেখে ত মজুমদার অবাক্‌! এ আবার কি! সে দিনও এর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল ; আজ আমার উঠানে ? এর মানে কি ? যাই হো'ক মজুমদার যেন আপ্যায়িত হইয়াছেন এইভাবে ভট্‌চাজকে বসতে দিলেন। তামাক সঙ্গেই ছিল ; হুঁকাটী তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন "খাও"

তামাক খাওয়া শেষ হ'লে ভট্‌চায্‌ বল্লেন—মজুমদার আজ তোমার কাছে এক মস্ত বিষয় লইয়া আসিয়াছি ; তবে অপমানের ভয়ে কথাটা বল্‌তে বাধ্‌ছে। কিন্তু না বল্লেও নয়।—বলিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন ; "বলব ভাই! অপমানের শোধ ত আজ তুলবে না ?" মজুমদার হাসিয়া বলিলেন—সবাই যদি বাড়ীর উপরে শত্রুকে পাইয়া অপমান করিত তাহ'লে মান জিনিসটা আমাদের দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেত। যাহোক কথাটা কি বলেই ফেল, মান অপমান ত শেষের কথা। ভট্‌চাজ একটী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—হয় ত শুনেছ ভাই ঐ জমিটুকু নিয়ে জমিদারের সঙ্গে মোকদ্দমা হইতেছে। মজুমদার কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়াই বল্লেন "বলে যাও।" "আমার হাতে একটিও পয়সা নাই ; কি করে মোকদ্দমা চালাই ? কেহও খালি হাতে টাকা দিতে চায় না। তার উপর আবার স্থদ চায়—কেউ ২৲, কেউ ৸৵১০ আনা ইত্যাদি : তাই তোমার কাছে এলাম, হাজার হলেও ছেলেবেলার বন্ধু, ফেলতে পারবে না।—তুমি এখন কি বল ?"

মজুমদার এমনই একটা সুযোগ খুঁজিতেছিলেন—মনে মনে হাসিয়া, বলিলেন—"তার জন্য ভাবনা কি ? তোমার কত চাই ?"

"পাঁচ হাজার।"

পাঁ—চ হাজা—র ! আচ্ছা, সে থাক এখন বল কি হিসাবে নেবে ? আমি কিন্তু ভাই একটু কিছু না নিয়ে খালি হাতে দিতে পারব না। আর স্থদ সে না হয় তুমি সাড়ে বার আনা হারেই দিও ; তার জন্য কি ?"

ভট্চায ভাবিতে লাগিলেন "বেশ সুবিধায় পাওয়া গেল' এত শীগ্গীর পাব আশা ছিল না। মুখে বলিলেন তোমার ত ভাই সবই জানা আছে, বল [illegible]— তোমার সুবিধা হয়—আর টাকা কিন্তু পরশু দিতে হবে।"

"পরশু কেন, আজই নাও না ?"—তবে কথাটা হচ্ছে কি যে একটা লিখিত লেখা পড়া চাই ত ? কি বল ?—

"সে ত সত্যি।"

তবে যে সুবিধার কথা বল্লে সেটা ঐ সুদোর মহালটা হলে ভাল হয়।"

ভট্চাজ মশাই কিছু ক্ষুণ্ণ হলেন, তবু টাকা চাই যে ? নইলে হবে না—"তাই ঠিক রইল ; পরশু জেলায় গিয়ে একটা লেখাপড়া করা যাবে। টাকাটা সঙ্গে নিও। আমি এখন উঠি।"

"আচ্ছা"

ভট্চাজ রাস্তা ধরিলেন, মজুমদার হাঁক দিলেন—মেধো ! ওঃ মেধো তামাক দিয়ে যা !

তার পর লেখাপড়া করে টাকা ও জমীর অদল বদল হইয়া গেল।

ভট্চাজ বল্লেন "তুমি আজ আমার যে উপকার করলে তাহা আর জীবনেও শোধ দিতে পার্ব না—।"

(৩)

"মানুষে বলতে বলে বাঘের আর জমীদারের আড়ি।" বাঘের সম্মুখ থেকে পালিয়ে গেলে আর ভয় থাকে না কিন্তু জমীদারের সঙ্গে লাগলে তার আর নিস্তার নাই।"

মোকদ্দমায় জমীদারের জয় হইল, তিনি দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন—"দেখি ব্যাটার কত টাকা আছে ?"

দেওয়ানকে ডেকে বল্লেন "রামশরণ ভট্চায্যির নামে চার নম্বর বাকী খাজনার নালিশ আজই রুজু করবে"

দেওয়ান "আজ্ঞে" বলিয়া চলিয়া গেল।

তারপর হঠাৎ একদিন ভট্‌চাযি্যি মশায় দেখলেন আদালতের পিওন তার হাতে একখানা সমন দিয়ে গেল আদালতে হাজির হবার জন্যে। ক্রোধে, ক্ষোভে তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে তিনি ভাবতে লাগলেন—"কি করি"—"টাকাত নাইই, তাতে আবার সুদোর মহাল বাঁধা পড়ছে; পর পর সমস্ত জমিগুলি মজুমদারের হাতে বাঁধা পড়ল"—"আর উপায় নাই"—মজুমদারও আর টাকা দিতে চায় না—"আজ বাদে কাল কোথায় থাক্‌ব কি খাব তার ঠিক নেই।" ভাবিতে ভাবিতে ভট্‌চায পৃথিবী অন্ধকার দেখিলেন—বৈঠকখানার মধ্যে অস্থির ভাবে পদচারণা করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুতেই কোন উপায় হইল না। অবশেষে তাঁর আশা ভরসা ভগবানের পায়ে সঁপে দিয়ে স্নানাহ্নিক করিতে গেলেন।

(৪)

এদিকে মজুমদার ভট্‌চাযি্যির সমস্ত বিষয় হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছেন; ভট্‌-চাযি্যির কেবল বসত বাটী ও কয়েক বিঘা জমি মাত্র অবশিষ্ট আছে; সেটুকু নিতে পারলে মজুমদার প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পান। মজুমদার লোক খুব ভাল ছিলেন; তিনি তাহার সুদে আসলে সমস্ত টাকাটা জমীর ফসল ও খাজানা হইতে উঠাইয়া লইয়া, বাকী সমস্ত টাকা ভট্‌চাযের নামে ব্যাঙ্কে জমা দিতেছেন। কিন্তু ব্যাঙ্কওয়ালাদিগকে এবিষয়ে ভট্‌চাজকে কিছু বল্‌তে বারণ করিয়া দিলেন এইরূপে তাহার প্রতিশোধের স্তর সকল গ্রথিত হইতে লাগিল।

ওদিকে ভট্‌চায্‌ প্রথমে মুন্‌সেফ কোর্টে হারিয়া জজের নিকট আপীল করিলেন, তাহাতেও জমিদারের জিত হইল। তিনি ডিক্রী পাইলেন—সর্ব্বসমেত প্রায় তিন হাজার টাকা; কিন্তু তখন তাহার তিনটি পয়সা দিবার ক্ষমতা নাই। তিনি নিরুপায় হইয়া পড়িলেন; কি করেন—উপায় কি? এক মাস পরে জমীদার অস্থাবর ক্রোক দিলে তিনি কোথায় দাঁড়াইবেন? এমনি তাহার জমি জিরাত—মায় ভিটাটুকু সমেত মজুমদার গ্রাস (?) করিয়াছেন। কি উপায়ে জমীদারের হাতে পায়ে ধরে অব্যাহতি লাভ কর্‌ব? তখনই মনে হ'ল—না! প্রাণ থাক্‌তে পার্‌ব না; যে আমাকে

মিথ্যা মোকদ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত করেছে ; যে আমাকে পথের ভিখারী করেছে—যে আমার সমস্ত মান সম্ভ্রম নষ্ট করেছে—সে আমার প্রধান শত্রু, সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান আততায়ী ; তার কাছে ভিক্ষা চাব ?—তা' হ'তে ভিক্ষা নেব—কখনই নয়—। কার কাছে ভিক্ষা চাব ? একটা শঠ, লম্পট, জুয়োচোর, মিথ্যাবাদীর কাছে ? একটা অস্পৃশ্য চণ্ডাল হইতেও যে নীচ তার কাছে ? ছিঃ ! ছিঃ !

আবার মনে হ'ল মজুমদারের কাছ হ'তে আর তিন হাজার টাকা এনে দি। কিন্তু সে আর দেবে কেন, এ পর্য্যন্ত যা দিয়েছে সে কেবল জমি দেখে। এখন আর কি দেখে ? আমার ত আর কিছুই নাই ; আমি যে আজ পথের ভিখারী অপেক্ষাও দরিদ্র ; আমার এমন বন্ধু কে আছে যে আমাকে এ সঙ্কট হ'তে রক্ষা করে ? ভাবিতে ভাবিতে তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না শয্যা গ্রহণ করিলেন।

দিন কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না, নিজের কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া চলিয়া যায়। মাস প্রায় অতীত হইয়া আসিল কিন্তু টাকার খোঁজ নাই ; কি করিয়া পরিবারবর্গের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিবেন তাহা তিনি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। মধ্যে আর একদিন মাত্র আছে, এর মধ্যে টাকার যোগাড়ের দরকার—না হ'লে ছেলে মেয়ের হাত ধরে ; রাত পোহালে, গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। উপায় কি ? ভাবিতে ভাবিতে তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন ; তাহার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, তিনি বসিয়া পড়িলেন।

(৫)

সেই কাল দিন আসিল ; আজ তাহাকে স্ত্রীপুত্র লইয়া পথে বসিতে হইবে। সকাল হইতে না হইতেই জমীদারের লোক কাড়া ও পিয়াদা লইয়া হাজির, সঙ্গে মজুমদার আছেন ; তার হাতে এক তাড়া কাগজ। জমীদারের লোক হাঁক দিল—"কই ভট্চায বেরোও—না হলে অপমান করতে বাধ্য হ'ব।"

ভট্চায্ মশাই পরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইতেছেন ; এমন সময় মজুমদার বলিলেন—"কোথা যাও ভাই, নিজের বাপ পিতেমে'র ভিটে ছেড়ে ?"

ভট্চায কাঁদ কাঁদ হয়ে বলিলেন—"আমার এ বাটীর বাস ফুরিয়েছে ; এখন

আর আমার অধিকার নেই ; যাই যেখানে ভগবান নেন !"

মজুমদার লাফ দিয়া তার সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন হাত ধরিয়া বলিলেন—"বাড়ীর ভিতর যাও ভাই ; এদের নিয়ে এখানে কেন ? আমি এখনও বেঁচে আছি ! যাও এদের নিয়ে এখানে আর দাড়িয়ো না যাও !"

তারপর পাওনাদারের লোকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"এই নাও তোমার টাকা। এখান হ'তে চলে যাও।"

জমীদারের লোক চলিয়া গেলে, মজুমদার "ভট্‌চায্‌" বলিয়া ডাক দিলেন। ভট্‌চায কৃতজ্ঞতা জানাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন ; কিন্তু মজুমদার বাধা দিয়া বলিলেন —"থাক।"

* * * * *

তারপর দুইজনে বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘণ্টা দুই ধরিয়া অনেক পরামর্শ, কথাবার্ত্তা হইল। তারপর মজুমদার উঠিয়া যাইবার সময় কি একতাড়া কাগজ তার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন "এই নাও তোমার সব।"

ভট্‌চায্‌ বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন— "তুমি মানুষ না দেবতা !"

শ্রীসুশীলকুমার রায় চৌধুরী, ১ম শ্রেণী।

নববর্ষ।

শ্যামল শস্পের পত্রে বিচ্ছেদ মলিন শুভ্র
শিশির চুম্বনে
বসন্ত বিদায় বাণী বিধুর কোকিল কণ্ঠে
বিরহের তানে

ঋতুরাজ অবসান
নববর্ষ সম্ভাষণ
হাসির সমীরাঞ্চলে ভাসিতেছে নব বার্ত্তা
এ ভব ভবনে।

আশার আলোক দৃপ্ত দ্যুলোক পুলক মাখা
বিমল বদনে
উজ্জল লাবণ্য ছটা কজ্জল নয়ন লিপ্ত
অরুণ অঞ্জনে
পশিছে বঙ্গের গেহে
বিজয় প্রসাদ স্নেহে
জাগাইতে তন্দ্রাবিল অলস ঘুমন্ত প্রাণ
প্রকৃতি প্রাঙ্গনে।

নিভৃতে ঘুঘুর কণ্ঠে আকুল আরাবে
করুণ মুচ্ছনা
অবসন্ন কান্ত গীতি ভরে দেয় নৈদাঘের
স্বপ্ন উন্মাদনা
বিকশিত ফুল গন্ধ
ভ্রমর গুঞ্জন ছন্দ
আনন্দ হিল্লোল স্পর্শ প্রচারিছে বিশ্বে নব
অতীপ্সি প্রেরণা।

সরসী সলিল হারা কালানল ভাস্করের
শোষণ চুম্বনে
তৃষিত ধরিত্রী বক্ষ আসন্ন নিষ্পিষ্ট
তীব্র অনশনে

অলীক স্বপন চিত্র

ভাষায় তৃষিত নেত্র

বারিশূন্য কাদম্বিনী দুরাশার

নিস্ফল আহ্বানে ॥

সঙ্গীত আলাপ রত হলবাহী ক্ষেত্রে ধায়

চরণ চঞ্চল

উৎসাহিত বক্ষে চাপি ভবিষ্য আশার ধন

জীবন সম্বল ॥

রাখাল গায়ন গায়

উল্লাসে ধবলী ধায়

পুলকে কৃষক নাচে স্বেদ সিক্ত কলেবর

তৃষায় বিকল ॥

নিবিড় ঝোপের কুঞ্জে মুঞ্জরিত হাস্নাহানা

সৌরভ মধুর

চম্পক চামেলি গন্ধে বিমোহিত চিত্ত মুগ্ধ

কানন বধুর।

নব বর্ষ সম্ভাষণ

বিজ্ঞাপিছে সমীরণ

চ্যুত মধুর গন্ধ উন্মুক্ত বঙ্গের দ্বারে

বিলায়ে প্রচুর।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়, তৃতীয় শ্রেণী ॥

পুনর্ম্মিলন।
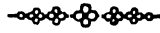
চৈত্র মাসের সন্ধ্যাকাল। ঋতু হিসাবে ইহা মধুমাস হইলেও মধুর পরিবর্ত্তে কেবল প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণজালই পৃথিবীতে বর্ষিত হইতেছিল। সূর্য্যদেব পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণের উদ্যোগ করিতেছিলেন। অস্তাচল চূড়াবলম্বী দিবাকরের ঈষল্লোহিত মরীচিমালা পৃথিবীতে তখনও অতিকষ্টে আলোকোদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছিল। ঐ আলোকচ্ছটা হিমালয়ের চির-তুষারাবৃত শিখরসমূহে প্রতিফলিত হইয়া শিখরগুলিকে স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিতেছিল। মৃদুমন্দ সান্ধ্য সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া নিদাঘ প্রপীড়িত প্রাণিগণকে প্রফুল্ল করিতেছিল। দিবস ও রজনীর এইরূপ অপূর্ব্ব রমণীয় সন্ধিক্ষণে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এক নির্জ্জন উপত্যকাস্থ একটী মন্দিরে একজন জটাজুট বিলম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী ব্যাঘ্রচর্ম্মের যোগাসনে সমাসীন ছিলেন। মন্দিরটীর কোথাও বা ধ্বসিয়া গিয়াছে, কোথাও কোথাও দুই একটী বটগাছ সমুন্নত শিরে মন্দিরের শিখরদেশে অবস্থান করিয়া নিজেদের সম্মান জগতের নিকট জাহির করিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছে। সেই ভগ্নপ্রায় মন্দিরের মধ্যে সন্ন্যাসীর সম্মুখে নৃমুণ্ডমালিনী কালীদেবীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। দেবীমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে নানাবিধ পূজোপকরণ বিকীর্ণ। সন্ন্যাসীর প্রশস্ত ললাট চিন্তা রেখাঙ্কিত। দেখিলে বোধ হয় তিনি কোন গভীর চিন্তাস্রোতে নিমগ্ন। কিয়ৎকাল এইরূপে কাটিল ধীরে ধীরে সূর্য্যরশ্মির শেষ রেখাটুকুও পশ্চিমাকাশের গায়ে বিলীন হইয়া গেল। পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। ভয়ঙ্করী তামসী নিশিথিনী মনোহারিণী সন্ধ্যাদেবীর স্থান অধিকার করিল। আকাশের গায়ে দুই একটি নক্ষত্র দেখা দিল। তখন সন্ন্যাসী একটী গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ সুপ্তোত্থিত সিংহের মত জলদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন "পাষাণি! এই আমার শেষ পূজা; আজ যদি আমায় মুক্তি না দিস্ তবে আমার জীবনের শেষও এই। মা! একমাত্র মুক্তির আশায়, একমাত্র মোক্ষলাভ

বাসনায় আমি এতগুলি মানব-শিশুর ঈষদুষ্ণ শোণিতে তোমার শোণিত-তৃষ্ণা দূর ক'রেছি। একমাত্র নিজের স্বার্থের জন্য নিজের সুখশান্তির জন্য শত শত লোকের অশান্তি উৎপাদন ক'রেছি। আর না! আমার এই অভিশপ্ত জীবনে আর কোন প্রয়োজন নাই! জীবনে সুখী হ'ব এই আশায় সংসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলাম, কিন্তু সে আশা সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। শেষে মুক্তির জন্য এই কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করিলাম। তাহাও যদি সফল না হয়, যদি আমার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায় তবে এই নিষ্ফল জীবনে স্বার্থকতা কি? 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন'—এই কথাটি স্মৃতিপথে অঙ্কিত ক'রে এতদিন এই কঠোর ব্রতের পালনে নিযুক্ত ছিলাম। কিন্তু আজ যদি আমার মন্ত্রের সাধন না হয় তবে তোমার সম্মুখে শরীর পাতন ক'রব।"—বলিতে বলিতে সন্ন্যাসীর কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল; আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি দেবীর পূজায় বসিলেন। প্রতিদিনের মত দেবীর পূজা সাঙ্গ হইল। পূজান্তে সন্ন্যাসী তাঁহার পার্শ্বচর, ভীমকায়, যমদূতাকৃতি, নিষ্ঠুরতার জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি এক ব্যক্তিকে শেষ দিনের পূজার জন্য বলির আয়োজন করিতে বলিলেন। পার্শ্বচর উঠিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে একটি গৌরবর্ণ হৃষ্টপুষ্ট দ্বাদশ বর্ষীয় বালককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া অপর একটি কক্ষ হইতে লইয়া আসিল। বালকটি অশ্রুপূর্ণ লোচনে উদাস নয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। যেন জন্মের মত পৃথিবীকে একবার দেখিয়া লইল। জন্মের মত করুণাময়ী দেবীর ভৈরবী মূর্ত্তির দিকে একবার তাকাইল।

তারপর শেষ দিনের মত ভগবানের স্মরণে ব্যাপৃত হইল। বালকটিকে সন্ন্যাসী দেবীর নিকট উৎসর্গ করিলেন এবং উহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার জন্য পার্শ্বচরকে আদেশ করিলেন। গুরুর আদেশে পার্শ্বচর বালকটীকে বধ্যভূমিতে লইয়া গেল, এবং সতৃষ্ণ নয়নে গুরুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী একখানি শাণিত খড়গ লইয়া বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং বালককে শেষ দিনের জন্য তার অভীষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করিতে বলিলেন। বালক সন্ন্যাসীকে আসিতে দেখিয়া ভয়ে ভগবানের নাম ভুলিয়া গেল, এবং করুণ স্বরে "মা, মা!" বলিয়া চীৎকার করিয়া

উঠিল। বালকের মুখে "মা, মা" শব্দ শুনিয়া সন্ন্যাসী হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। এ যেন তার পূর্ব্ব পরিচিত কণ্ঠস্বর। এ স্বর যেন তিনি বহুদিন পূর্ব্বে কোথায় শুনিয়াছেন। তিনি সন্দিগ্ধচিত্তে বালককে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক তখনও বায়ু-বিকম্পিত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতেছিল। সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক বারংবার প্রবুদ্ধ হইয়া সে কিয়ৎ পরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইল। এবং ভীতি-ব্যাকুল কণ্ঠে ধীরে ধীরে তাহার পরিচয় জানাইল। শুনিয়া সন্ন্যাসীর চক্ষু সজল ভাব ধারণ করিল। তিনি আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে বালককে কোলে লইলেন।

সন্ন্যাসীর এইরূপ ভাবান্তর দর্শনে বালক হতবুদ্ধি হইয়া গেল। পার্শ্বচরও অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল; এমন কি কিছুক্ষণ কোন বাক্য স্ফূর্ত্তি করিতে পারিল না। অবশেষে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া গুরুকে পূর্ব্বের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিল। তখন সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন—"সে আজ সাত আট বৎসরের কথা, মনে হইলে এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হয়, এখনও সর্ব্ব শরীর ভয়ে শিহরিয়া উঠে, তখন ইংরাজ রাজ্যের সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। তখনও দেশের প্রকৃত শাসন ভার নবাবের হাতে ছিল। ইংরাজেরা রাজস্ব আদায় করিতেন মাত্র। তাঁহারা প্রজাদের সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন না। নবাবও এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। কাজেই দেশের মধ্যে ভয়ানক অরাজকতা চলিতেছিল, মানুষের ধনজন কিছুই নিরাপদ ছিল না। দস্যু তস্করের ভয়ে সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতে হইত,—তখন আমার বাড়ী ছিল কৃষ্ণনগরে। সেখান হইতে গঙ্গাসাগর যাইবার জন্য সপরিবারে নৌকাপথে যাত্রা করি।

বৈশাখ মাস, সন্ধ্যা হইয়াছে, সূর্য্যদেব সেদিনের মত অস্তাচলের গুহায় শয়ন করিয়াছেন, মৃদুমন্দ বাতাস বহিতেছে। এমন সময়ে আকাশে অল্প অল্প মেঘ দেখা দিল। ক্রমে ক্রমে মেঘগুলি আকাশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে বাতাসের বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঝড় উঠিবার উপক্রম হইল। মাঝিরা সভয়ে নৌকা তীরের দিকে লইবার চেষ্টা করিল—পারিল না। বাতাসের প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া নৌকা বিপথে চালিত করিতে লাগিল। শেষে মাঝিরা হাল ছাড়িয়া দিল।

সবাই চিরদিনের মত ভগবানের নাম স্মরণে প্রবৃত্ত হইল। তার পর সব শেষ হইল। নৌকা ডুবিল। কোথায় কে গেল কিছুই স্থিরতা রইল না। পরে কি হইল কিছুই জানি না। যখন আমার জ্ঞান হইল তখন দেখি আমি এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে শয়ান। উন্মুক্ত বাতায়ন পথে প্রভাত সূর্য্যের অপূর্ব্ব কিরণচ্ছটা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে-ছিল। প্রভাত বায়ুর সংস্পর্শে আমি যেন পুনর্জ্জীবন লাভ করিলাম! তখন পূর্ব্বের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল। গণ্ডদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হইয়া আসিল। সন্ন্যাসী আমাকে তদবস্থ দেখিয়া কাঁদিতে নিষেধ করিলেন। সন্ন্যাসীর প্রবোধবাক্যে আমি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম। তিনি আমাকে দুধ পান করিতে বলিলেন। নিতান্ত অনুগতের ন্যায় আমি তাহার আদেশ পালন করিলাম। সন্ন্যাসী আমাকে প্রত্যহ নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিতেন, নানা প্রকার উপদেশ দিতেন। আমি একাগ্রমনে শুনিয়া যাইতাম। আর এমন নির্জ্জন স্থানে, এমন অসহায় অবস্থায় যে এরূপ একটি সহায় মিলিয়াছে এজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিতাম,—সন্ন্যাসী মধ্যে মধ্যে মনের আবেগে গান গাহিতেন।—

"বিধির লিখন, কে করে খণ্ডন
ভুঞ্জিতে হয়গো নরে।
রাজ্য অধিকারী, হয়গো ভিখারী
পূরব করম ফেরে।
মাতুল গোবিন্দ যার, পিতা পার্থ ধনুর্দ্ধর
সেই অভিমন্যু যবে।
পড়িলেন রণে বিধির লিখনে
কিবা কথা আমা সবে।"

—কি সুন্দর সেই গান। অনেক গান শুনেছি, কিন্তু অমনটি আর শুনি নাই, সেই নির্জ্জনে সন্ন্যাসী মুখনিঃসৃত গানটি আমার কর্ণে সুধা বর্ষণ করিত। গানের ভিতর কি মাধুর্য্য! কি প্রাণ মাতানো ভাব! বোধ হ'ত উহা স্বর্গীয়। স্বর্গের ছন্দে স্বর্গবাসীর হাতে তৈয়ারী, গান শুনিয়া আমি আত্মহারা হইতাম, নিজেকে ভুলিয়া যাইতাম, নিজের দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া যাইতাম।—এইরূপে সুখে সন্ন্যাসীর সঙ্গে কিছুদিন

কাটিল। শেষে তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া হিমালয়ে আসিলাম। বিদায়ের সময় তিনি বলিলেন—"বৎস! অধীর হইও না! কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মের জন্য আসিয়াছ, ফল ভগবানের হাতে।" নিয়তিই সর্ব্বনিয়ন্ত্রী, আজ যেমন দৈব তোমার উপর বিরূপ দুদিন পরে আবার হয়ত তেমনি সদয় হইবেন, অতএব গত বিষয়ের জন্য শোক প্রকাশ করিও না।

হিমালয়ে আসিয়া একজন গুরুর নিকট দীক্ষিত হইলাম। কিছুদিন পরে গুরুর স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিল। তখন এই নির্জ্জন স্থানে একাকী জীবন যাপন করা নিতান্ত কষ্টকর হইল। একবার ভাবিলাম বাড়ী ফিরিয়া যাই। সবই ত সেখানে আছে। আবার ভাবিলাম আমার সর্ব্বস্ব যা তা'ত গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি। এই ভাবিয়া বাড়ী ফিরিলাম না। এই মন্দিরে দেবীর পূজা করিতাম আর অপরাহ্নে শস্য শ্যামলা বাংলার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতাম আর গাহিতাম, সন্ন্যাসীর সেই—

"বিধির লিখন কে করে খণ্ডন
ভুঞ্জিতে হয় গো নরে।

চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিত। মনে মনে ভাবিতাম ঐত সে বঙ্গভূমি, যেখানে আমি সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া পালিত হয়েছি। ঐত সেই বঙ্গভূমি যাঁর ফলেজলে প্রতি-পালিত হ'য়ে এত বড়টি হ'তে পেরেছি। ঐত সেই গঙ্গা যার প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তে আমার সব বিসর্জ্জন দিয়েছি।—"আর ভাবিতে পারিতাম না একটিবার সেদিনকার মত বাংলার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ফিরিয়া আসিতাম। এমনিভাবে একাকী এই নির্জ্জন উপত্যকায় দিন কাটাইতে লাগিলাম শেষে তোমাকে সহায়রূপে পাইলাম এই কঠোর ব্রতে ব্রতী হইয়া মুক্তির জন্য শত শত মানবশিশুকে———"

সন্ন্যাসী আর বলিতে পারিলেন না, শুধু একটা তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে উদাস নয়নে নক্ষত্র খচিত আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, বোধ হইল এতদিনের জমাট বাঁধা শোক দুঃখ আজ দীর্ঘ নিশ্বাসরূপে শরীর হইতে বাহির হইয়া গেল।

* * * *

পরদিনের প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে সন্ন্যাসী কালী দেবীর প্রস্তর মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিয়া আসিলেন। শেষে বালকটিকে ও পার্শ্বচরকে সঙ্গে করিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে দিতে বহুদিন পরে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীসন্তোষকুমার মিত্র, ১ম শ্রেণী।

School Discipline in its different aspects.

Truth is tuth and falsehood is falsehood. There can be no case of more truth or less truth or more falsehood and less falsehood. So also light implies the absence of darkness and darkness implies the absence of light. If any semblance of falsity finds place in a truth the excellence of it ceases to exist, and the admirer of truth rejects it atonce with scorn. Similar is the case with discipline. So far as educational institutions are coderned, "Discipline means an easy and effective control of children under instruction, and the maintenance of such spirit of law and order among them that they willingly and readily submit themselves to the teachers guidance." Such a type of disciplide is called good discipline. But when it is stained with any the slighest tinge of those elements which decrease the conotation of discipline then we call it bad or no discipline. Thus we can have no intermediany stage or degrees of discipline. If any one of the conditions of good discipline enunciated above, is absent in its code that discipline becomes fraught with evils, and fails to realise its aim. Thus it is evident, we teachers need the genuine type of discipline to maintain perfect order in the sphere of our duties.

The universe is a living example of eternal and peaceful order. The earth together with the other planets has been performing its rotations and movements with perfect harmony—there is no disturbrance and disorders in any quarter. God's creation has been being guided and controlled from time immemorial, in accordance with certain established laws. Had not order been strictly kept there would have been endloss chaos and confusions. The sun

rises in the east and sets in the west, but he has never been seen to rise in the west and set in the east. The other phenomena of nature also abide by some such laws enacted by God. But human being has been empowered by God to direct and control his propensities by himself. This rational authority and control over men's propensities exercised to realise the desired end may be called discipline In other words when orderliness is produced purposely it is called discipline. The aim of discipline, therefore, is how to derive the maximum number of benefits with minimum expenditure of efforts. "By disciplinary influence is meant the combined agencies which the teacher brings to bear upon the child to induce him volanterily to put forth efforts in the desired direction, to train him to steady appication and prompt and willing obedienece, to strengthen him to act more and more independently until he is able to become a law unto himself." All works have to be done under-conditions and the conditions have to be taken into account in the schocl-room as well as in any other place of work. The important thing in this connection is to make the conditions as present and as conductive to success as possible and turn by ouer method of treatment any influence that is opposed to our efforts, into a useful direction.

To secure this end successfully it is not enough for the teacher to be well informed about what he is to teach or even to be able to communicate knowledge skilfully he must have the power to influence children which is rather a matter of character and of insight into child-nature than of intellectual ability ; since instruction alone is notoriously insufficient for education.

The ultimate purpose of all educational measures is most fruitfully concieved as the formation of charactor, and means of discipline is nothing but the enternal cultivation of habits. Man being a bundle of habits educators should have recourse to those measures which most fruitfully help the formation of good habits. According to the eminent educatiunal reformers all sorts of disciplinary measures constitute what is called government. To carry on this government in an educational institution the following requisites are necessary :—

(1) Constant employment—Incessant activity is a law of the child's being and hence this activity should be directed to desirable channels.

(2) Close supervision :—The second requisite for a system of good government is, he who governs should be a vigilant observer of his charges. "Begin betimes," says the sagacious Locke, "nicely to observe your son's temper and that when he is least under restraint, in his play, and as he thinks out of your sight. See what are his predominant passions and prevailing inclinations, whether he is fierce or mild, bold or bashful, compassionate or cruel, open or reserved. For, as these are different and your authority must, hence take measure to apply itself in the different ways to him."

(3) Commands :—When the above two have had the desired effect upon the child; occasion will inevitably arise when the educator must issue difinite & specific commgnds. But they should gradually become fewer as the years advance. These commands should be few & given once for all, with decision & preconsideration. Commands should be positive rather than negative. and general rather than particular.

(4) Rules :—The next requisite is a number of rules which are a sort of permanent commands. Like commands these rules too, should be well thought out before hand and as few as possible.

(5) Punishment :—When these 4 kinds of requisites fail to produce desired effect then the next one, nemely punishment should be resorted to. The word Punishment includes the repressive measures of control. "By punishment we mean the intentional infliction of pain of some sort, as a consequence of some special offence against laws written or unwritten, of a school or community. In a school it may take the form of with-holding some expected pleasure, or one of various positive forms such as the imposition of tasks and bodily chastisement. "Punishment is a bad thing. "It is the last resort of flouted authority." Three views are held as regards the aim of punishment. (a) Preventive, deterent or exemplary, (b) Corrective or reformative (c) retributive. According to the first the purpose of punishment is to deter others

from commiting a like offence. According to the second it is to reform the offender; according to the third it is to cause the offence to recoil upon the offender's own head.

From the educator's stand point there are elements of truth in each of the three views stated above.

The school is a society in miniature. So, order must be maintained here and as such the exemplary view of punishment must be upheld within the proper limits. Again if the punishment is truly retributive i.e suitable to the offence in kind and degree, it stands a fair chance of being reformative & preventive. The theory of natural consequences being inadequate to supply the requisites of good discipline the teacher must have recourse to one or other of the requisites mentioned above.

No two souls being similar in every respect, first of all, the teacher is required to be acquainted with the varied nature of his pupils. A minute study of child-nature is what is indispensable on the part of the educator. From the psychological point of view it is also evident that there is a close relation between the practice of instruction and the theory of discipline. Because, discipline when taken as means of forming good habits it constitutes an important part of the teacher's Art. Consequently the teacher is to see whether he is capable of conducting his work of government in conformity with the proper method of imparting instructions.

Editor.

EDITORIAL.

By the grece of the Almighty God "Aradhana" reached its Forth year on the 1st of Baisakh current. Though a feeble outcome of combined efforts of some immature brains yet it has not altogether failed in its mission. May God prolong its being for a prosperous end.

As usual the magazine committee for 1334 B. S. has been duly formed with the Head master as president and Babu Anukul Chandra Mukherjee B. A. as Teacher members. The old editor will discharge the editorial functions for the current year.

SCHOOL NOTES.

1. Reconstruction of the Managing Committee :—

During the middle of December last the reconstitution of the Managing Committee was duly effected with a notable change—the popular and worthy District Magistrate being the president elect. The newly formed committee was approved by the District Magistrate on the 15th December 1927. The institution may reasonably expect a bright future under the present managers and specially under the the guidance of the District Magistrate.

2. Renewal of the Govt. grant :—

It may be gratifying to all concerned that the Government grant of Rs. 100/- a month to the school has been renewed in time. The authorities have always been trying to set the institution on a better and sounder footing and this renewal of the grant is a testimony to the fact.

3. Change in the staff :—

"Old order changeth yielding place to new."

In obedience to the Law of change the world is always passing through a mighty transformation. Fresh batch of men come in and go out by turns, but time glides on in its useal course. Some seven teachers have been replaced by new ones in a year's time. We hail our newly appointed brothers with cordial greetings and bid a hearty adieu to those who parted with us to turn over a new leaf. May God grant us a happier and more properous future.

4. A visit of the D. P. I. of Bengal :

E. F. Caten Esqr. M. A., Director of Public Instruction, Bengal, graced the institution with his kind visit on Saturday, the 2nd of April. He held out bright hopes for the school in the near future. In his opinion the school now well deserves permanent recognition of the University and an enhanched amount of grant from the Government. He desired to see another building erected on the spot, and further remarked that the status of teachers should be raised by increasing the scale of their pay. Full justice shall

আরাধনা।

(খুলনা বি, কে, ইউনিয়ন স্কুলের মুখপত্র)

চতুর্থ বর্ষ। { ১৩৩৪ সাল। { পৌষ সংখ্যা।

ভোরের বাঁশী।

নীরব আমার এক তারাটি,
নিথর ভোরে আজিরে ?
উদারার ঐ উদার তানে—
নিখিল মাঝে সাজিরে।
দূর অনন্ত নিসীম পানে,
বিশ্ব পাগল মুখর গানে,
বিভোর ভোরের স্তব্ধ প্রাণে—
জেগে উঠ বিশ্ব যোড়া,
চেতন সুরে বাজিরে।
ওরে। আমার ঘুমলো বীণা,
নিরাল ভোরে গুঞ্জরি ;—
আকাশ যোড়া সাধন নিয়ে,
স্বপন পুরে সজাগ দিয়ে,
ললিত তানে জেগে ওঠ—
বিরল দেশে সাড়া দিয়ে—
গভীর সুরে ঝঙ্কারি।

জগত সাধে যে সাধনায়,
সে তান সাধ নিঝুম বীণায়,
বিশ্বজনীন প্রেমের সুরে,
তারই সুর বাজিরে।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়,
তৃতীয় শ্রেণী।

Religion—ধর্ম্ম।

এই ধর্ম্মবিপ্লবের যুগে, সদাই এক প্রশ্ন হৃদয় মধ্যে উদিত হয়। কেবল যে উদিত হয়, তাহা নয়—মায়ামুগ্ধ অবোধ মনকে ধাঁধাঁর ভিতর ফেলিয়া দেয়। ধর্ম্ম কি ? যাহা ধরিয়া থাকিলে, যাহা মানিয়া চলিলে, যে ভাবে কার্য্য করিলে মানব সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে—পাপকে অস্পৃশ্য মনে করিয়া পুণ্যকে আশ্রয় লয়—সেই মনোভাবকে ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করা চলে। কথাটী বোধ হয় বুঝাইতে পারিলাম না—একটী উদাহরণ দিলে ইহার ভাষা সহজগম্য হইতে পারে, তাই উহার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।—দরিদ্রা অনাদৃতার গর্ভজাত রাজপুত্র ধ্রুব পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য কঠোর তপ করেন। তপে তুষ্ট হইয়া ভগবান সশরীরে তৎসকাশে উপস্থিত। প্রশ্ন হইল—বর লও। ধ্রুব বুঝিল—সে যাহা ধরিবার আশায়, পাইবার ভরসায়, ইহ সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় এতদিন এই কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিল,—তাহা উদ্‌যাপন হইয়াছে—তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে—সে ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে—ধর্ম্মই তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে—তাই সে বোধিসত্ত্বের ভাষায় বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে—তাহার ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে। সে উত্তর দিল—আমি বর চাই না—

যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য মুনিঋষিগণ যুগ যুগান্তর অনাহারে কঠোর তপস্যা করিয়াও প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই—আমি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি কাঁচখণ্ড খুঁজিতেছিলাম—বহুমূল্য কাঞ্চন লাভ করিয়াছি—আমি বর চাই না। যাহা দ্বারা মানব সংসারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া শান্তি লাভ করে, তাহাকে ধর্ম্ম বলা চলে—তাই আমাদের মতে ধ্রুবের ধর্ম্ম লাভ হইয়াছিল।

অধুনা ভারতে হিন্দুমুসলমানপ্রীতির অভাব পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। ইহার কুফল বিভিন্ন স্থানে নানা প্রকারে প্রকট হইতেছে। অল্পবয়স্ক ছাত্রগণের হৃদয়েও এই অপ্রীতির বীজ উপ্ত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণীতেই মধ্যে মধ্যে এই ধর্ম্মবিদ্বেষভাবাপন্ন বালকগণ পরস্পরের অপ্রীতিভাজন হইতেছে দেখা যায়। "হিন্দুজাতি পৌত্তলিক— গাছ, পাথর, খড় কুটা পূজা করে; উহাদের ধর্ম্ম নাই।" "মুসলমানের ধর্ম্ম সেদিনকার, খৃষ্টধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক যিশুখৃষ্টের জন্মের পাঁচ, ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্ম ছিল না—এ ধর্ম্ম, ধর্ম্মই নহে।" এ সকল কুট তর্ক তুলিয়া মুসলমান ছাত্রগণ হিন্দু ছাত্রগণকে, আবার হিন্দু ছাত্রগণ মুসলমান ছাত্রগণকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, ও নিজেদের মধ্যে মিত্রতার পরিবর্ত্তে নানারূপ মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিতেছে। শিক্ষকগণ কোন শ্রেণীতে উপস্থিত হইলে ছাত্রগণ তাঁহাদিগকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে থাকে—"ধর্ম্ম কি? কোন্ ধর্ম্ম বড়? কোন্ ধর্ম্ম ভাল?" শিক্ষক বলিয়া লেখককে অনেক সময় এই সকল প্রশ্নের সমাধান ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইয়া থাকে। সময় সময় কোন কোন শিক্ষকের একদেশদর্শিতার জন্য ছাত্রদের এই মনোমালিন্য হৃদয় মধ্যে দৃঢ় হইয়া পড়ে। অল্পবুদ্ধি সরল প্রকৃতি ছাত্রগণের হৃদয়ের মনোমালিন্যের ভাব যাহাতে দূর হয় তজ্জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ছাত্রগণের সমক্ষে উপস্থিত করা লেখকের অভিপ্রেত।

ভগবান্ এক—দুই বা বহু নন—ইহা সকল ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব। যে তাঁহাকে যে ভাবেই আরাধনা করুক না কেন,—সরল বিশ্বাসে প্রাণ খুলিয়া উহা করিতে

পারিলেই তাহার মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্মের ছোট বড় নাই। ধার্ম্মিকের নিকট, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর নিকট, সকল ধর্ম্মই সমান ভাবে পূজ্য। বিভিন্ন স্থানে বাস হেতু মানব যেমন একই বস্তুকে বিভিন্ন নাম প্রদান করিয়াছে—সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরকেও "কেহ বা জিহোবা, জোভ্ কেহ প্রভু কয়"। তাঁহাকে প্রাপ্তির জন্য কায়মনোবাক্যে তাঁহার উপাসনার ভাষার বিভিন্ন নামকরণ করা হইয়াছে। ইহাই বিভিন্ন ধর্ম্ম বলিয়া মনুষ্যের নিকট অভিহিত। বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবানের আরাধনার বিভিন্ন পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। একই রোগ চিকিৎসার জন্য কবিরাজ, ডাক্তার, হাকিম প্রভৃতি চিকিৎসকগণ যেমন পৃথক পৃথক ঔষধের ব্যবস্থা করেন এবং তদ্বারা প্রত্যেকেই রোগ নিরাময়ে সমর্থ হয়েন, সেইরূপ ধার্ম্মিক মহাপুরুষগণের পন্থা বিভিন্ন হইলেও গন্তব্য স্থান একই। সেই সকল বিভিন্ন পথে তথায় পৌঁছান যায়। যেমন ক্ষেত্রভেদে একই ফসলের আশায় বিভিন্ন রকম বীজ বিভিন্ন সময়ে বুদ্ধিমান কৃষক বপন করে, সেইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতি ও শক্তিশালী মানবকে বিভিন্ন ভাবে শিক্ষা দিবার বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে। অনাদি, অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্‌কে ক্ষুদ্রমতি মানবের হৃদয়ঙ্গম করা সহজসাধ্য নয় বলিয়া, ধার্ম্মিক বুদ্ধিমান মহাপুরুষগণ যুগ বিশেষে তাঁহার রূপ-নির্ণয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ধর্ম্ম জগতে যাঁহারা বালক—তাঁহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য যেরূপ সরল সহজ ব্যবস্থা আবশ্যক, যাহারা এ ক্ষেত্রে কিছুদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন তাঁহাদিগকে একটু জটিল ভাবে—একটু আধ্যাত্মিক ভাবে শিক্ষা দেওয়া চলিতে পারে। স্বভাবের মহান্ শক্তিকে পূজা করা, সৌন্দর্য্যের সেবা করা মানবের প্রকৃতি। সৌন্দর্য্যের ভিতর মানবশিশু এই মহাশক্তিকে ভগবান্ (ষড়ৈশ্বর্য্যশালী) বলিয়া উপাসনা করে। গুণের ধারণা করিতে হইলে প্রথমতঃ গুণের আধারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। আধার জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় লাভ হইলে তাহার গুণাবলী হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। এই গুণের সম্যক জ্ঞান হইলেই আধার দৃষ্টির আবশ্যকতা থাকে

না। সরল ভাষায় বলিতে হইলে শিক্ষা ক্ষেত্রে যেমন বর্ণজ্ঞানের পূর্ব্বে "দাগা বুলান" আবশ্যক, ধর্ম্মজ্ঞানের পূর্ব্বেও সেইরূপ দ্রব্যে রূপত্ব আরোপ আবশ্যক। তাই নিম্নস্তরের মানবের জন্য সাকার উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যেক মানবই ঈশ্বরের অবতার বা তাঁহার সন্তানকে পূজা করিয়া থাকে। বীরপূজা সর্ব্বদেশে প্রচলিত। ভগবানের অংশীভূত সাধু মহাপুরুষগণ সকল মানবেরই উপাস্য। আমরা স্থূলবুদ্ধি বলিয়া নানারূপ মিথ্যা ভ্রমে পতিত। কোন মানবই শক্তি ভিন্ন অন্য কিছুর উপাসনা করেন না। শক্তির নিকট মস্তক আপনা হইতেই অবনত হয়। বলিতে বলিতে অনেক কথা বলা হইয়াছে। আসল কথা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া কাহারও ধারণা হইয়াছে। সে যাহাই হউক না কেন গোড়ামি ত্যাগ করিয়া যাহাতে বালকগণ ধর্ম্ম বিষয়ে উদারনীতি অবলম্বন করে, ইহাই আমার একান্ত অভিপ্রেত। বর্ত্তমানে যাহারা বালক অদূর ভবিষ্যতে তাহারাই আমাদের সমাজের নেতা হইবেন। তাহারা ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সংকীর্ণমনা না হ'ন ইহাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই প্রবন্ধ দ্বারা যদি একজনের হৃদয়ে ক্ষণিকের জন্যও ধর্ম্ম বিষয়ে সরল ভাব ও উদারনীতি পরিস্ফুট হইয়া ধর্ম্ম বিদ্বেষ দূর হইয়া যায় তাহা হইলেও আমার কার্য্য সফল মনে করিব। "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।" এই সাধু বাক্য স্মরণ করিয়া বাল্যকাল হইতেই যাহাতে বালকগণ ধর্ম্মপ্রাণ ও সুনীতি পরায়ণ হয় তৎপ্রতি তাহাদের ও তাহাদের শিক্ষকগণের ও অভিভাবকগণের একান্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমার এই সামান্য প্রবন্ধ শেষ করিলাম। ভরসা—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে, মা ফলেষু কদাচন।"

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়চৌধুরী,
শিক্ষক।

অভিশপ্ত জীবন।

সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। দূরে দিকচক্রবাল সীমায় মৃত্যুম্লান তপন রক্তনেত্র মুদিয়া পাটে সমাসীন। অদূরে সান্ধ্য-সমীরণে ঈষদ্দোদুল্যমান বিটপীরাজির-বিটপ সমূহের মস্তকে দিবাকর পরিত্যক্ত স্বর্ণচ্ছটা প্রতিভাত হইয়া এক অপূর্ব্ব ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। অনতিদূরে নটিনী-নৃত্যে কলনাদনা তটিনী-সমূহ পর্ব্বতগাত্র বহিয়া নিম্নে অবতরণ করিতেছে। অসীম সৌন্দর্য্যশালিনী নিস্তব্ধ প্রকৃতি দেবী নীরবতার গুণগানে সমাগতপ্রায়-সন্ধ্যাদেবীর আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন।

এমনি এক সন্ধ্যাকালে হিমালয়ের পাদদেশে কোন একটী তিব্বতীয় উপত্যকায় একটী কুটীর সম্মুখে দুইটী সন্ন্যাসী উপবিষ্ট। কুটীরে বাসোপযোগী কোন আসবাব ছিল না, কেবল প্রত্যহ পূজা করা হয় এরূপ কতকগুলি চিহ্ন বিদ্যমান। কুটীর সম্মুখে কুশাসনে এক অতি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আসীন। সন্ন্যাসীর বয়সের অনুমান করা কঠিন, বোধ হয় শতাধিক হইবে, পরিধানে গৈরিক বসন, মস্তক পক্কজটাজালে সমাকীর্ণ। মুখমণ্ডল শ্বেত শ্মশ্রু দ্বারা আবৃত। সন্ন্যাসীর সমুন্নত ললাটে ত্রিপুণ্ড্রাকৃতি চন্দন লেপন। সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডল হইতে এক দিব্যজ্যোতি-চ্ছটা বহির্গত হইতেছিল। তাঁহার সম্মুখে এক নবীন সন্ন্যাসী, তাঁহার দেহাভরণ দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছিল যেন তিনি মাত্র কয়েক দিবস পূর্ব্বে সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন। সন্ন্যাসীদ্বয়ও নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে অদূরবর্ত্তী দ্রুমসমাকুল নিবিড় অরণ্য হইতে বন্য কুক্কুট ও শৃগালের বিকট চীৎকারে তাঁহাদের নিস্তব্ধতায় কিয়ৎ পরিমাণে ব্যাঘাত জন্মিতেছিল। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে নবীন সন্ন্যাসী মৌন ভঙ্গ করিয়া বলিল, "প্রভো! অদ্য রজনীতে আপনার অতীত জীবনের ঘটনাবলী বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাই অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আপনার জীবনী শ্রবণ করিতে আমার অত্যন্ত

বাসনা জন্মিয়াছে”। সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, “বৎস। আজ আমার সমাধি রজনী, তজ্জন্য তব সকাশে আমার জীবনী বলিতে ইচ্ছুক ছিলাম, কিন্তু বৎস, সে যে প্রায় শতাব্দীর অতীত ঘটনাবলী, আমার স্মৃতিপট হইতে তৎসমূহ বিলুপ্ত-প্রায়”। নবীন সন্ন্যাসী বলিলেন, “দেব! যতটুকু আপনার স্মৃতিপথে বিদ্যমান থাকে তাহাই বলুন, শ্রবণ করিয়া আমার কর্ণযুগল পরিতৃপ্ত হউক ”।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, “বৎস! তোমার শ্রবণকৌতুহল নিবৃত্তি করিবার জন্য মদীয় স্মৃতিপথারূঢ় ঘটনাবলী বিবৃত করিতেছি শ্রবণ কর”। সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন, “ঐ যে শস্যশ্যামলা শান্তিময়ী চৈতন্যদেবের অবতরণ ভূমি, কলুষনাশিনী গঙ্গোদকে বিধৌত চিরপবিত্র দেবলীলাক্ষেত্র বঙ্গদেশ, ঐ আমার জন্ম স্থান, ঐ বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালীর গৃহে বাঙ্গালী মায়ের গর্ভে আমার জন্ম হয়—বিশ্বনিয়ামকের বিধানে মানব মাতৃগর্ভ হইতে একটী প্রস্ফুটোন্মুখ পবিত্র স্বর্গীয় পারিজাত পুষ্পের ন্যায় ভগবানের প্রতিচ্ছবিস্বরূপ শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হয়, স্বর্গীয় বিমল জ্যোতিতে সর্ব্বদা শিশুর দেহমন উদ্ভাসিত হইতে থাকে, তখন পার্থিব স্বার্থে পূতিগন্ধ-কুটজাল-সমাচ্ছন্ন চিন্তায় তাহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয় না—সেইরূপ একটী শিশু হইয়া আমিও জন্ম নিয়াছিলাম।”

ক্রমে ক্রমে আমি পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিলাম, তখন একদিন হঠাৎ আমি মাতৃস্নেহহারা হইলাম, তখন আমি মাতৃস্নেহের কি মর্ম্ম তাহা ভাল করিয়া বুঝিতাম না, তবুও এইটুকু বুঝিলাম যে মাতৃহরণ অভিশপ্ত জীবনে বই হয় না। পিতৃস্নেহে কতকটা মাতার অভাব পূর্ণ হইল। ক্রমে ক্রমে সংসারের সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিলাম, তখন একদিন আমার জীবন প্রবাহ একটী অদ্ভুত সঙ্গীর সহিত মিলিত হইল, পার্থিব সৃষ্টিতে সে স্বর্গীয় দেবী; তাঁর মতন আর একটী আমি কোথায়ও দেখি নাই। কি এক দিব্য জ্যোতিতে তাঁর মুখমণ্ডল সমুদ্ভাসিত, কি এক ভাব তাঁর বদনে সমাবিষ্ট, সে ভাবের মুখ আর দুটী দেখি নাই; সে কি এক চাহনি! সে চাহনিতে মর্ত্ত্যবাসী এমন

অনেকেই আছেন যাঁরা স্থির থাকিতে পারেন না। ভগবান যেন সমস্ত সৌন্দর্য্য দিয়া তাঁকেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, হৃদয় তাঁর নবনীত অপেক্ষা ও কোমল ক্ষরণশীল, একটু মাত্র স্নেহ-তাপ সংস্পর্শ হইলে তাঁর হৃদয়কন্দর হইতে অশ্রু-নির্ঝরিণী কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইত—আমি তাঁর রূপ-গুণমোহে অল্প দিনেই মুগ্ধ হইলাম, সংসারের কর্ত্তবাকর্ত্তব্য ভুলিলাম; সর্ব্বদা কোন্ স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম, পিতাঠাকুরের প্রতি কর্ত্তব্য ভুলিলাম—সে এক অদ্ভুৎ মানুষ হইলাম।

তারপর—তারপর সে মোহনিদ্রা একদিন ভাঙ্গিল"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া সন্ন্যাসীর কণ্ঠরোধ হইল, চক্ষে দুই এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ন্যাসী প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "বৎস! সে বড় ভয়ানক দিন, সে দিনের ঘটনা এখনও আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতেছে। আমি স্বহস্তে তাঁহার শ্মশানশয্যা রচনা করিয়া সেই শয্যায় তাঁহাকে শায়িত করিয়া জগৎ হইতে তাঁহার অস্তিত্ব, তাঁহার নাম পর্য্যন্ত বিলোপ করিয়া দিলাম; লক্ লক্ করিয়া চিতা জ্বলিয়া উঠিল সঙ্গে সঙ্গে আমারও হৃদয়-চিতা হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তারপর শূন্য হস্তে শূন্য হৃদয়ে শূন্য গৃহে ফিরিলাম। সে ভয়ানক আঘাতে হৃদয়-তন্ত্রীশতধা ছিন্ন ভিন্ন হইল, সে, কি এক অব্যক্ত ব্যাকুলতা জন্মিল। হৃদয়ে এতটুকু শান্তি পাইবার জন্য আমি পাগলবৎ বৃক্ষ প্রস্তর হইতে হিংস্র জন্তু পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করিতে লাগিলাম ক্রমে আমার সে ভীষণ ব্যাকুলতা আমাকে উন্মাদ করিল; আমি ইতস্তত: দৌড়া দৌড়ি করিতে লাগিলাম। এই ভাবে কয়েক দিবস অতিবাহিত হইল, পরম করুণাময় ভগবানে আমার বীতশ্রদ্ধা জন্মিল, জগতের যাহাতে একটা ভীষণ ক্ষতি হয় তাহাই করিতে স্বতঃই আমার প্রবৃত্তি জন্মিতে লাগিল। সে ভীষণ ব্যাকুলতা ক্রমে ভীষণ কঠোরতায় পরিণত হইল। আমি ডাকাইতি করিতে অভ্যস্ত হইলাম। এখন নররক্ত দেখিলে আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে, নরহত্যা আমার ব্যাবসায় হইয়া উঠিল। এইরূপ প্রতিদিন

আমি নররক্তে তর্পণ করিতাম। আমার নাম তখন দেশে বাহির হইয়া পড়িল, দেশ প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত আমার নামে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। শিশু আমার নামে মাতৃস্তন্য ত্যাগে মাতৃবক্ষে শিহরিয়া উঠিত, এমনই আমার আতঙ্কে দেশ ভরিয়া গিয়াছিল। তারপর এমনই একরাত্রি—চন্দ্র নাই—আলোক নাই ঘোরা তিমির মাত্রাত্মক। বিলুপ্ত নীলিমা-অম্বর-পটে নক্ষত্র-দীপক জ্বলিতেছিল—কিন্তু সে স্বল্প দীপ্তিতে অন্ধকার যেন আরও প্রগাঢ়—আরও ভয়ানক হইয়া উঠিতেছে। সমস্ত বঙ্গভূমি নীরব নিথর। আমি আমার সদলবলে এক ধনী গৃহে ডাকাইতির জন্য বহির্গত হইলাম। ধনীর অট্টালিকার ছাদে উঠিলাম, এবং নিম্নে শয়নগৃহে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম বহুমূল্য কারুকার্য্যখচিত পালঙ্কের দুগ্ধফেননিভ শয্যায় অপ্সরা সদৃশা এক নবীনা, আর তার বক্ষে ফুটন্ত পারিজাতের ন্যায় এক শিশু অঘোর ঘুমে অচেতন। সে বহুদিনের কথা আমার স্পষ্টরূপে স্মরণ হইতেছে না। অলঙ্কার লোভেই হউক আর অন্য কোন উদ্দেশ্যে হউক আমি শিশুটীকে মাতৃবক্ষচ্যুত করিয়া হস্তস্থিত তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিলাম। তার'—পর"—তার'''—প''''—বলিয়া সন্ন্যাসী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, নবীন সন্ন্যাসী অতি সত্বর তাঁহার ভূলুণ্ঠিত দেহ তৃণশয্যায় স্থাপন করিয়া অদূরবর্ত্তী ঝরণা হইতে স্বীয় উত্তরীয় সিক্ত করিয়া জল আনিলেন এবং সন্ন্যাসীর চক্ষে মুখে উহা সেচন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সন্ন্যাসী পুনশ্চৈতন্য লাভ করিলেন, এবং কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর আবার বলিতে লাগিলেন, "সে ভীষণ দৃশ্য আমার জীবনে মরণে স্মৃতির সহিত গাঁথা হইয়া গিয়াছে, শিশু হত্যার পর হঠাৎ সেই কথা যেন স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল আমি যেন বিদ্যুতের ন্যায় আলোক সহ্য করিতে পারিলাম না—মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম, কয়েক মুহূর্ত্ত পরে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে আমি দেখিলাম যেন সেই আলোকমালার মধ্যে আমার সেই জীবনের সঙ্গিনী উপবিষ্টা। তিনি আমাকে বলিতেছেন, "হে স্বামিন্! আমি তোমার জন্য কত কষ্ট পাইতেছি,

তুমি এইরূপ নরহত্যা করিতেছ আর আমি তোমার মিলনাশায় শূন্যে শূন্যে ঘুরিয়া নিশিদিন কত কষ্ট পাইতেছি, হে নাথ! এখনও তুমি এ ঘৃণিত ব্যবসায় পরিত্যাগ কর, সৎ হও, নতুবা আমাদের মিলন সুদূর পরাহত"। এই বলিয়া সে ছায়া মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার জীবনের গতি ভিন্ন পথে ধাবিত হইল। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আমি স্বদেশে আর মুখ দেখাইব না, এই মুহূর্ত্তে আমি সন্ন্যাস অবলম্বন করিব। ধনীগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কত কত তীর্থক্ষেত্র ঘুরিলাম, কিন্তু আমার হৃদয়ে যে বহু বৎসর কালানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল তাহা নির্ব্বাপিত হইল না; কেহ আমাকে শান্তি দিতে পারিল না। ঐ যে অদূরস্থিত ঝরণাটী দেখিতেছ, অবশেষে ভ্রমণ করিতে করিতে ঐটীর তীরে উপস্থিত হইলাম, মনে আক্ষেপ হইল, জীবনে বহু পাপ করিয়াছি কিছুমাত্র পুণ্য সঞ্চয় করি নাই আর এ জীবন দ্বারা কোন কার্য্য নাই—আত্মহত্যা করিব। জলে ঝাঁপ দিব পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সুদীর্ঘ জটাজুট সমন্বিত এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল তিনি তন্মুহূর্ত্তে হস্তধারণ করিলেন এবং বলিলেন, "বৎস! ক্ষান্ত হও পাপের পর আর মহাপাপ করিও না"। তৎপরে তিনি আমাকে দীক্ষা দিলেন এবং তদবধি আমি এই কুটীরে বসিয়া তপস্যা করিতেছি। আজ আমার সমাধি রজনী, রজনী আড়াই প্রহরে আমি সমাধি আসনে আসীন হইব। আজ আমার মিলনের রাত্রি, আজ আমার সঙ্গীর সহিত অচ্ছেদ্য মিলনের রাত্রি, আজ কি আনন্দ! কি অপূর্ব্ব আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইতেছে!!" এই বলিয়া সন্ন্যাসী নীরব হইলেন।

শ্রীশিশির কুমার ঘোষ
প্রথম শ্রেণী।

সৃষ্টির অন্তরালে।

অখিল বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বরের প্রত্যেক বস্তুর অন্তরালে একটী উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। কি নগ-নদাদি বিরাজিত স্থলভাগ, কি বীচিমালা বিক্ষোভিত গভীর সমুদ্র, কি অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র বিরাজিত গগনমণ্ডল, প্রত্যেকটীর অন্তরালে অতি সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। জীব-জগৎও তদীয় অচিন্ত্য মহিমা ও অপার করুণা স্মরণে মানব কেন যে বিস্ময়ে অভিভূত হয় না, সেইটাই সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়। মানব তাহার আপাততঃ বিবেচিত জ্ঞানে যাহা দোষনীয় কার্য্য মনে করে, তাহার অন্তরালে যে কোনও নিহিত উদ্দেশ্য নাই তাহা কে বলিবে? অনন্তময়ের অনন্ত লীলার উদ্দেশ্য বুঝা যেমন মানবজ্ঞানের বহির্ভূত তেমনিই তাঁহার সৃষ্টবস্তু সমূহের উদ্দেশ্যও সুকঠিন। তবে ঐ কাঠিন্যের দ্বারে হতাশ হৃদয়ে বসিয়া থাকিলে মানবত্বের পূর্ণতা সম্পাদন হইবে না; ঐ দ্বার ভাঙ্গিতে হইবে, ঐ দ্বার অভ্যন্তরে যে অমূল্য মণিরত্নাদি গচ্ছিত রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটীর ভিতর সুচতুর শিল্পীর যে রহস্যময় উদ্দেশ্য আছে, সে গুলির ভিতরে মগ্ন হইয়া যে মানব-হৃদয় সেই অনন্ত ভাবের ভাবে ভক্তিরসে আপ্লুত না হইয়া উঠে সে যে হৃদয়ই নয় তাহা কে না বলিবে?

ভূমিকম্প সর্ব্বধ্বংসকারী, কোন প্রকার ধ্বংসশক্তি ইহার সমকক্ষ নহে, মৃত্যু জীবন্ত প্রাণীকে ধ্বংস করিতে পারে, ঐ মহাসমুদ্রের কি কিছু করিতেপারে? প্রচণ্ড বাত্যা মানবের গৃহাদি উড়াইয়া লয়, গগনস্পর্শী দ্রুমমালাকে ধরণীর বক্ষে পাতিত করিয়া শক্তির পরিচয় দেয়, কিন্তু ঐ অত্যুচ্চ পৃথিবীর মেরুদণ্ড স্বরূপ হিমগিরিমালার কিছু করিতে পারে কি? কিন্তু ঐ সর্ব্বধ্বংসকারী ভূমিকম্পের হস্তে প্রত্যেক স্থাবর জঙ্গমের ধ্বংস-রজ্জু ন্যস্ত রহিয়াছে, যেটীর যখন আকর্ষণ হইবে তাহার তখন যাইতেই হইবে। ঐ অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ, যে আজ পৃথিবীর বক্ষ ভেদ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান, সেও একদিন ঐ রজ্জুর

আকর্ষণে তার গর্ব্বিত-মস্তক অতল-তলে প্রবেশ করাইতে বাধ্য, আবার অত্যুচ্চ উর্ম্মিমালা-বিক্ষুব্ধ, সংহারক রুদ্রমূর্ত্তিধারী অম্বোধি এক মুহূর্ত্ত-ইঙ্গিতে দিব্য ভূমিতে পরিণত হয়। মানব বুদ্ধির আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রত্যেকে কি মনে করে না, যে এমন একটী সর্ব্ব-ধ্বংসী অনিষ্টকারী বিষয় জগদীশ্বর কেন সৃষ্টি করিলেন? জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় প্রত্যেকে বলিবেন যে, "সর্ব্বপ্রকার ধ্বংসের নায়ক এমন অনিষ্টকারী ভূমিকম্প যদি পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইত তাহা হইলে কত সুখে, কত শান্তিতে বুঝি বাস করা যাইত"। কিন্তু ঠিক তা নয়, ঐ সর্ব্ব-ধ্বংসকারিণী শক্তির অন্তরালে সর্ব্বরক্ষাকারিণী শক্তিও বিদ্যমান। মানুষ তাহার শ্রেষ্ঠত্বের আখ্যার গর্ব্বে ফাঁপিয়া ফাঁপিয়া যথার্থ এতই ফাঁপিয়া উঠিয়াছে, সে ঐ অসীম শক্তিমতী প্রকৃতির কার্য্যাবলীর মধ্যে যে কত ক্ষুদ্র তাহা ভাবিবার সময় পায় না, তাই তাহার ঐ অত গর্ব্ব যে কত অর্থহীন আড়ম্বর তাহাই বুঝাইবার জন্যও বোধ হয় ঐ ভূমিকম্প সৃষ্টির একটী উদ্দেশ্য। মানুষ তার নির্ম্মিত সমুন্নত হর্ম্ম্যরাজির সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া মনে করে, এমনি সুখ-স্বচ্ছন্দে তার দিনগুলি কাটিয়া যাইবে। তাই সে তার গর্ব্ব-উন্নত বক্ষে নিজের ক্ষমতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতা মনে করিয়া সেই করুণাময়ের শক্তিতে নির্ভর হারায়, এমনি ভাবে মানুষ অহঙ্কারে গর্ব্বে তাহার মনুষ্যত্বের গণ্ডি হইতে পশুত্বের গণ্ডিতে পা দেয় তাহাই বুঝিবার সুযোগ দিতে বোধ হয় ভূমিকম্পের কতকটা উদ্দেশ্য। আর মনে করুন যদি ভূমিকম্প একেবারেই না হইত তবে কি সৃষ্টিকার্য্য রক্ষা পাইত? সৃষ্টির আদিম সময়ে কয়েক খণ্ড মাত্র ভূমিভাগ ও পরিশিষ্ট জলভাগ ছিল, যদি ভূমিকম্প না হইত তবে ঐ বারিধির তরঙ্গাঘাতে আজ ঐ ক্ষুদ্র স্থলভাগগুলি কোথায় অন্তর্হিত হইত। যদিও কেহ কেহ বলিবেন যে এই ক্ষুদ্র তরঙ্গাঘাতে কি এত বড় ভূমিখণ্ড নিঃশেষিত করিতে পারে? তাঁহাকে আমাদের বলিবার এই যে, আপনি কি শুনেন নাই যে, "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিন্দু পতনেও বৃহৎ শিলাখণ্ডও ক্ষয়িত হয়"। জলে স্থলে মিশ্রিত হইয়া সর্ব্বধ্বংসকারী

দিবসকে অতি প্রত্যুষেই ডাকিয়া আনিত, তাহা একটু চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। আমরা যে ক্ষুদ্র ও মহৎ দ্বীপপুঞ্জকে সমুদ্র বক্ষে দেখিয়া থাকি তাহা যে ঐ ভূমিকম্পের কার্য্য তাহা বোধ হয় আর সবিশেষে বুঝাইতে হইবে না। এখন দেখুন দেখি, ঐ সর্ব্ববিধ্বংসী ভূমিকম্পকে আমরা পূর্ব্বে ভূপৃষ্ঠ হইতে অপসারিত করিতে চাহিয়াছিলাম, এখন কি আমরা ঐ সম্বন্ধে এক মত হইতে পারিব? তার ধ্বংসকারিণী শক্তি অপেক্ষা কি তার রক্ষাকারিণী শক্তি প্রবল নহে? কিন্তু ঐ বিষয়টী অতি গূঢ় বলিয়া সাধারণ চক্ষুর বাহিরে।

Chambers Journal এ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন যে—"Such a catastrophe as this serves indeed to show how poor and weak a creature man is in presence of the grand workings of Nature. At first sight it may seem paradoxical to assert that earthquakes, fearfully destructive as they have so often proved, are yet essentially preservative and restorative phenomena; yet this is strictly case. Had no earthquakes taken place in old times, man would not now be living on the face of the earth; if no earthquakes were to take place in future, the term of man's existence would be limited within a range of time for less than that to which it seems likely in all probability to be extended. Now, if we suppose the destruction of land to proceed unchecked it is manifest that at some period, however remote, the formation of shoals and banks must come to an end, owing to the continual diminution of the land from the demolition of which they derive their substance. In the meantime, the bed of sea would be continually filling up, the level of the sea would be continually rising, and thus the banks would be either wholly submerged through the effect of this cause alone, or they would have so slightly an

elevation above the sea-level that they would offer little resistance to the destructive effects of the sea, which would then have no other land to act upon."

এত বড় একটা ধ্বংসকারী শক্তির অন্তরালে যখন এত বড় একটী মহদুদ্দেশ্য বর্ত্তমান, তখন আমরা মানুষ আমরা ভগবানের গৌরবময় সৃষ্টবস্তু, আমাদের সৃষ্টির পিছনে নিশ্চয়ই কোন না কোনও মহদুদ্দেশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা কি সেই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যস্ত হই ? আজ মানবকে জিজ্ঞাসা করুন, "হে মানব তুমি যে উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়ে এ মহাপরীক্ষাগারে অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহা কি তুমি সম্পাদন করিতেছ ?" কেহই বোধ হয় ইহার সমঝঙ্কারে উত্তর দানে সমর্থ হইবেন না। শুধু আহার বিহারই কি আমাদের মহৎ জীবনের উদ্দেশ্য ? প্রকৃতি তাঁহার বিরাট-নীরব-কণ্ঠে মানব জীবনের মহান্ উদ্দেশ্যগুলি কীর্ত্তন করিতেছেন, তাই বুঝি প্রাতঃস্মরণীয় ৺মহাত্মা মহম্মদ ও বুদ্ধদেব তাঁহাদের জীবনের কর্ত্তব্য এবং উদ্দেশ্য শ্রবণ করিতে নির্জ্জন পর্ব্বতে, গিরিকন্দরে প্রকৃতির বিরাট ক্ষেত্র মনোনীত করিয়া লইয়াছিলেন। মানব যদি তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য গুলিকে ধ্রুব তাঁরার ন্যায় লক্ষ্য রাখিয়া জীবন-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে সচেষ্ট হয়, তাহা হইলে কি ঐ সর্ব্ব পবিত্রাধার ভূমি আজ এমন হিংসা-দ্বেষপূর্ণ দুঃখসাগর হইয়া উঠিত। মানব জাকজমকের চরম সীমায় উঠিয়া গর্ব্বিত হওয়া, সংসারের পাপ পঙ্কিল স্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়া মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয়। হে ধনিন্! তোমার ঐ ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রাসাদের অধিষ্ঠাতা হইয়া, ঐশ্বর্য্যের চূড়ায় আরোহণ করিয়া, সর্ব্ব প্রকার ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করিয়া ভাবিতেছ যে, মানব জন্ম সার্থক করিলাম। আর দরিদ্র আজন্ম দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নে নিষ্পেষিত হইয়া ভাবিতেছে যে, "ভগবান আমার কি দুর্দৈব অভিশপ্ত জীবন দান করিয়াছেন," তাই দারিদ্র্যের সহিত জীবনান্ত সংগ্রাম করিয়া নিস্তব্ধ হতাশ বক্ষে সেই শেষের দিনের অপেক্ষা করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সম্পাদন করিতেছে।

হে মানব! এই কি মহিমময় মানব জীবনের উদ্দেশ্য? জগদীশ্বরের সিংহাসন তল হইতে এই উদ্দেশ্য লইয়াই কি আমরা কয়েক দিবসের জন্য এই মর জগতে আসিয়াছি?

"না—না—না মানবের তরে
আছে উচ্চ লক্ষ্য সুখ উচ্চতর
না সৃজিলা বিধি কাঁদাতে নরে"

এস জগদ্বাসী নর! এস সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ কুসুম মানব! জগদ্বরেণ্য বিশ্ববিধাতার মহিমা কীর্ত্তনে আকাশ পাতাল প্রকম্পিত করিয়া আবার আমাদের মহান্ জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য হৃদয়-পটে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া লই, এবং উদ্দেশ্য-ধ্বজা জগতে উত্তোলন করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করি।

হে বিশ্ব-বিধাতৃগণ্! হে অনন্ত করুণাময়! আবার তোমার ঐ অভয় হস্তে আমাদিগের উপর আশীষ বর্ষণ কর, যেন তোমার পুত্ররূপে তোমার প্রেরণার উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আবার তোমার চরণ সমীপে উপস্থিত হইতে পারি।

শ্রীশিশির কুমার ঘোষ
১ম শ্রেণী।

প্রার্থনা।

কেহ নাহি মোর স্নেহ করিবার।
তাই ডাকি প্রভু এস একবার॥
অশান্ত হৃদয় দূরেতে ফেলিয়ে।
সুখ শান্তি তথা দাওগো আনিয়ে॥

মোহিত হইয়া সংসার মায়ায়।
ছিনু এতদিন ভুলিয়া তোমায়॥
তাই কি আমারে এ ভব মণ্ডলে।
সঙ্গীহারা করে সংসার অনলে॥
পাঠাইয়া মোরে দিতেছ যাতনা।
(পুরিল না মোর কোনই বাসনা)॥
হৃদয় আমার জ্বলে অনিবার।
চরণ যুগল না পেয়ে তোমার॥
আর না বহিব সংসার বন্ধনে।
স্থান দাও নাথ পবিত্র চরণে॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী
প্রথম শ্রেণী।

মূকের উক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত হইবার পর।)

(৫)

তিন মাস দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। সময় কাহারও জন্য বসিয়া রহিল না। সে আপনার গন্তব্য পথেই গমন করিতে লাগিল। একদিন হঠাৎ বজ্রপাতের ন্যায় কৃষ্ণদাস তাহার ফেলের সংবাদ শুনিল। দুঃখের উপরে আবার দুঃখ। তাহার আর পড়িতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু তাহার আবার পড়িতে হইল—শুধু কেবল তাহার ভ্রাতা হরিদাসের অনুরোধে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য-বশতঃ সে এবারও ফেল হইল। সে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া চাকুরীর অন্বেষণ করিতে লাগিল।

*　　　*　　　*

জগতে আজকাল বি, এ, এম, এ, পাশ করিয়া কি করিতেছে? তাহাদের অবস্থা খুবই খারাপ। যাহারা ধনী তাহাদের কথা পৃথক। যাহারা গরীব তাহাদের কষ্টের একশেষ হইতেছে। তাহারা আজকাল বিশ পঁচিশ টাকার জন্যও আবেদন করিতেছে। কৃষ্ণদাস ত এফ, এ পাশ—তার আবার চাকুরী কি হইবে? যেখানে এম, এ, বি, এ,রও জায়গা নেই—সেখানে কৃষ্ণদাসের কি হইবে? তবুও সে ধৈর্য্যহীন হইল না। সে যথাসাধ্য চাকুরীর উমেদারী করিতে লাগিল। এখন আর তার সে বাবুগিরি নাই—সে আদ্দির পাঞ্জাবী বা চশমাও নাই। এইরূপে তার দিন কাটিতে লাগিল। একমাস ঘোরাঘুরি করার পর সে একটী চাকুরীর সন্ধান পাইল—কিন্তু সেখানে হীনজাতির লোক লওয়া হইবে না। অতএব সে সেখানে কাজ পাইল না। আজ তার মনে বি, এ, এম, এ পাশের প্রতি ঘৃণা জন্মিল। সে দুইটি পাশ করিয়াছে—তবুও তার চাকুরী হইল না। সে ভাবিতে লাগিল, "হায়! আমার এখন কি হইবে?" সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে বোধ হয় যদি দশ পনের টাকার চাকুরীও পাইত তবুও সে অনায়াসে করিত। এখন তার এমন সঙ্গতি নাই যে তার পিতার জমি ক'খানি চাষ আবাদ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। কিন্তু সে দিন আর নাই তারই শিক্ষার জন্য সনাতন তাহার পাঁচখানি জমির মধ্যে তিনখানি জাফর আলীর কাছে বাঁধা দিয়াছে। আর মাত্র দুইখানি আছে—তাতে আবার ভাল ফসল হয় না। তাতে কৃষ্ণদাসের কি হইবে? তাই সে একটু চাকুরীর চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বিধাতা তার উপর এমনই বিরূপ সে যেখানেই চাকুরীর আবেদন করিতে লাগিল সেখানেই বিফল মনোরথ হইতে লাগিল। এইরূপে মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইল।

(৬)

প্রাতঃকাল। পৌষের শেষ। শিশির বিন্দু তখনও ঘাসের গাত্র হইতে

শুকাইয়া যায় নাই। তখনও বৃক্ষ কবরি হইতে শিশির বিন্দু পতিত হইতেছিল। কাক তখনো তার মধুর কা, কা স্বরের দ্বারা জানায় নাই, "রাত্রি ভোর হইয়াছে। তোমরা সবাই উঠ। নিজের নিজের কার্য্যে মনোনিবেশ কর।" তখনও কেহ নৈশ নিদ্রা হইতে জাগরিত হয় নাই। কেবল একজন লোক সকলের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়াছিল—সে কৃষ্ণদাস। ঘুম যেন তার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। সে বারান্দার দাওয়ায় বসিয়া তাহার নিজের অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতেছিল। তাহার নিকট এক একটি মিনিট যেন এক একটি বৎসর মনে হইতেছিল। দিনগুলি আর ফুরাতে চায় না। এইরূপে বেলা ১১টা বাজিয়া গেল। এই সময় ডাক পিয়ন আসিয়া কৃষ্ণদাসকে এক খানি পত্র দিয়া গেল। পত্রখানি আসিয়াছিল—বাঁকুড়া হইতে—তার চাকুরীর আবেদন মঞ্জুর হইয়া। তাহার একটু আশা হইল। সে ঠিক সময়ে বাঁকুড়া যাত্রা করিল। সে পুরা উদ্যমে চাকুরী করিতে লাগিয়া গেল। আফিস হইতে তার মাহিয়ানা দিত। তার মাহিয়ানা ছিল তিরিশ টাকা। কিন্তু সে পাইত—কোন মাসে বিশ, কোন মাসে পঁচিশ। এইরূপে কৃষ্ণদাস তাহার দুঃখ-ভারাক্রান্ত জীবন কোন প্রকারে চালিত করিতেছিল। অনেক জিনিষই বাকী রাখিয়া জীবন চালিত করিতে হইয়াছে। কৃষ্ণদাস একদিন আফিসে গিয়াছে। তখন তার পাওনাদার তাকে তাগাদা করিল এবং টাকা না দিলে উঠিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। তাহার মাহিয়ানা বাবদ কোম্পানিতে প্রায় শতাধিক টাকা সে পাইত। কিন্তু যখন সে বড়বাবুর নিকট টাকার জন্য গিয়াছে, তখন তিনি আফিসে নাই। কিন্তু অচিরেই সে শুনিল যে বড়বাবু জেলে গমন করিয়াছেন। জেল। তুমি শান্তিরক্ষক। তোমারই প্রসাদে আজ আমরা বাঁচিয়া আছি। নহিলে ঘৃণ্য চোর ডাকাতের ভয়ে প্রাণটা হাতের উপর রাখিতে হইত। তোমার মহিমা অপার, তুমি কত পাপী লোকের ভার বহন কর তার ইয়ত্তা নাই। তোমার উদারত্বার ধন্যবাদ দিই। কৃষ্ণদাস যদিও একটু চাকুরী

পাইয়াছিল তাহাও কপাল দোষে রহিল না। কৃষ্ণদাস পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করিয়াছিল—কে জানে?

(৭)

অর্দ্ধাশনে অনশনে কলিকাতার পথে পথে বহুদিন খুঁজিয়া সে একটী চাকুরীর সন্ধান পাইল। তখন সেখানে একটী Dairy farm, চলিতেছিল। সেখানেই সে চাকুরী পাইয়াছিল। সেখানে অনেক গোজাতি ছিল। তাদের যত্ন করবার জন্য অনেক লোক নিযুক্ত ছিল। শুধু সে তাদের উপর প্রভুত্ব করবে, আর তাদের কাজ দেখাইয়া দিবে। কিন্তু ভগবান তাহার উপর বিরূপ—সে কিছুদিন পরে চাকুরী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

* * * *

আজ তার নিজের জাত ব্যবসার কাজই করিতে পারিল না। যদি সে উত্তমরূপে পৈত্রিক কার্য্য করিতে পারিত—তবে কি আজ তার ভাবনা! কিন্তু কি সে করিবে—সে তার ভদ্রাসন বাটীতে ফিরিয়া অসিল। কিরূপেই বা সে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। এ ভব সংসারে এক হরিদাস ব্যতীত আপন বলিতে কেহ নাই। সে তার ভাইকে তার দুঃখ জ্ঞাপন করিল। লুব্ধ কাক যেমন খাবার জিনিষের প্রতি তাকাইয়া থাকে সেইরূপ সে উত্তরের জন্য ডাক পিয়নের প্রতি তাকাইয়া থাকিত। কিন্তু পত্র না লিখিলে পিয়ন কোথা হইতে আনিয়া দিবে? একদিন হঠাৎ সে শুনিল যে হরিদাস চৌর্য্য অপরাধে জেলে পচিতেছে। কৃষ্ণদাসের কিছুই করিবার নাই—তাহার যে কিছুই নাই। যে ফুল শুকাইয়া গিয়াছিল তাহা আর ফুটিল না। অনুকুল পবনে চালিত তরণী আর চলিল না। সে কোন রকমে দেহটাকে টানিয়া লইয়া বাড়ীতে আসিল এবং ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। ভোর না হইতে সে চলিল তার পিতার জমির নিকট—যাহা বাঁধা পড়িয়াছিল জাফর আলির কাছে। ক্ষোভে দুঃখে সে পিতার জমির উপর লুটাইয়া পড়িল। সে চোখের জলে ভূমি ভিজাইয়া তাহার

নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল। বোধ হয় সে প্রার্থনা তাহার নিকট পৌছিয়াছিল না। সে জমি—আর তাহার হাতে আসিল না। কেবল তাহারই শস্যে জাফর আলির ভাণ্ডার পূর্ণ হইতে লাগিল। কৃষ্ণদাসের কানে সেই সুদূরের বংশীধ্বনির ন্যায় তার পাঠ্যজীবনের সুখের কাহিনী বাজিতে লাগিল—আর বজ্র ধ্বনির ন্যায় সেই বাকহীন ভূমির কলকণ্ঠ অভিশাপ। (সমাপ্ত।)

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, (দ্বিতীয় শ্রেণী।)

নাস্তিক।

(১)

হাঃ! হাঃ হাঃ! ব্যাটারা বলে কিনা ঈশ্বর! ঈশ্বর আবার একটা কি? হাঃ, হাঃ, হাঃ, একটা ভূত; ব্যাটারা যেমন ভূত, তাদের দেবতা সেই আর একটু বড় ভূত!

ঈশ্বর নেই! ঈশ্বর নেই! ঈশ্বর নেই! সবই প্রকৃতি। কে বলে ঈশ্বর আছে? সে দেখাক না আমাকে ঈশ্বর; থাকেত আমি নিজ হাতে পাঁ—চ কান মলা খাব দশজনের সামনে। ইঃ ভারী ত ঈশ্বর; তার আবার পূজো! আর হেসে বাঁচিনে?

এই ব্যাটা পণ্ডিত—না গাড়ল—দেখা তোর ঈশ্বরকে; না দেখাতে পারলে তোর হাড় গুড়িয়ে দেব মেরে; শীগ্‌গীর বল কোথা তোর ঈশ্বর! এখনও বল্‌লিনি?

মারের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পণ্ডিত বলিলেন "ঐ স্বর্গে", হাঃ। হাঃ! হা হা হা। হা। ঐ স্বর্গ টা আবার কিরে বাবা? সেও আবার একটা আছে নাকি? ওরে সে আবার একটা কি? আমার পেট ফেটে গেল। আর হাস্‌তে পারিনে! যা বেটা তুই এখানে থাকলে আজ আমার মরা মার কোল ভরে যাবে।

পণ্ডিত মহাশয় এতক্ষণ যূপকাষ্ঠ সন্নিহিত ছাগের ন্যায় কাঁপিতেছিলেন,

দুই এক পদ এগুয়েই আর কি ভো দৌড়—কারণ তিনি ছিলেন এই রকমের লোক যারা—'বিপদেই দিই বাঙ্গালীর মত চম্পট পরিপাটী।' যাচ্ছিলেন তিনি রাজসভায় কারণ তিনি ছিলেন সভাপণ্ডিত; আর তখন তাহার আগমনের সময় ছিল; সুতরাং দরজা পূর্ব্ব হইতেই উন্মুক্ত ছিল, অতএব বিনা বাধায় একেবারে রাজসভায় উপস্থিত।

(২)

মস্ত রাজসভা। রাজসভা না ইন্দ্রসভা। জাঁক জমকের অভাব নেই। স্তম্ভ সকল সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পমালায় সুশোভিত হইয়া রাজদরবারের আরও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছিল; মৃদু বাতাসে সেই ফুলের গন্ধ রাজা ও সভাসদ্‌গণের নাসিকায় সুবাস ছড়াইতেছিল।

পায়ের নীচে মোটা কারুকার্য্যখচিত কাশ্মিরী গালিচা পাতা; তাহার উপরে নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া পারিষদগণ মহারাজের—মুখপানে তাকাইয়া সঙ্কিতচিতে উপবিষ্ট ছিলেন। মহারাজ স্বর্ণাসনে স্বর্ণছত্রের ছায়ায়—শীতল রাজমুকুটের নিম্নে তাহার মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া রাজকার্য্য করিতে ছিলেন আর মাঝে মাঝে বৃদ্ধ বিজ্ঞ মন্ত্রীর চন্দ্রবিন্দু সংযুক্ত "এজ্ঞে মহারাজ" শুনিতেছিলেন। হঠাৎ দুপ্‌ দাপ্‌ শব্দে কক্ষ পূর্ণ হইয়া উঠিল; মহারাজ কানে কলম গুজিয়া যেই দেখেছেন ব্রাহ্মণ; তারপর আবার সভাপণ্ডিত! মহারাজ তাড়াতাড়ি আসন ছাড়ি উঠিয়া দাড়াইয়া ব্রাহ্মণকে সম্মান দেখাইলেন। "পণ্ডিত মাশাই ওরকম করছেন কেন?" পণ্ডিত মহাশয় হাপাইতে হাপাইতে বলিলেন—মহা— —রাজ—মহা-রাজ। একটা নাস্তিকের জ্বালায় আপনার 'রাম রাজত্বিতে' আর বাস করা গেল না। ব্যাটা আজ আবার আমায় ধরেছিল; কিন্তু মহা-রাজের আশীর্ব্বাদে আর আমার চৌদ্দ পুরুষের পুণ্যির ফলে, মহারাজ আজ আবার আপনার "নবীন-নীরদ-শ্যাম নীলেন্দী-বর লোচন" দেখতে পেয়েছি! মহারাজ! এর একটা বিহিত কিছু করেন; এর একটা ব্যবস্থা না করলে

আমাদের চ'লে যেতে হবে আপনার রাজ্যি ছেড়ে।

এবার ঠাণ্ডা মাথা একটু গরম হইল। একটু কেন? বেশ একটু—রাগে চোখ লাল করিয়া মহারাজ হাক দিলেন —

"কৈ হ্যায়, হররাম সিং?"

"হাজির হুজুর; আপকা গোলাম হাজির—"

"সৈ নাস্তিক্‌কো পাকড়কে লে আও ঝট্‌ভি যাও।"

"যো হুজুর! সেলাম।" বলিয়া হররাম চলিয়া গেল।

ব্যাটার জ্বালায় রাজ্যটা একেবারে গোল্লায় যাবার যো হয়েছে আর কি। ব্যাটার সঙ্গে আর পেরে উঠি না। ব্যাটাচ্ছেলে এলে আজ তার একদিন আর আমার একদিন; এসে নিক্ আজ সে, কেটে কুচি কুচি করে জলে ফেলে দেব। কিছু বলি না কি না তাই নাই পেয়ে গেছে। আজ হাড় গুলো সব খেকী কুকুর দিয়ে খাওয়াব আর মাংসটুকু খাবে কাকে আর শকুনে।

(৩)

আমাদের সেই প্রকৃতি-বাদী তখন 'কালিন্দীতট বিপিন সঙ্গীত তরলে' মগ্ন। গান হচ্চে 'পেট পুরে মদ খাই' ইত্যাদি। এমন সময় যমদূতাকৃতি হররাম সিং গিয়া তাহার হাতের বোতল নদীর জলে ফেলে দিয়ে, বল্ল 'চোল বেটা? মোহারাজ তোলপ দিয়েছে।'

'তা চল বা-বা তার জন্য আর কি? গেলে কি আমাকে তার রাজ-সিংহাসন দেবে? না, আমি সিংহাসন নিব না আমার সেই 'কদম্বরেণু বিছাইয়ে ফুল শয়নেই'—থাকাই ভাল। কাজ নাই আর রাজ-সিংহাসনে।'

আস্তে আস্তে তাহারা দরবারে প্রবেশ করিল। নাস্তিকের তখন 'আঁখিয়া ঢুলু ঢুলু মদিরা পানে।' তা হলে কি হয় সে তাহার শিষ্টাচার সমাধা করিল 'স' যায়গায় 'ছ' কহিয়া—'নমছ্‌কার মহাছয়। আমি মুক্ত পাখীর সমান ছিলাম আমাকে আবার এখানে আনা হল কেন?'

'আরে ব্যাটা পাজি' বলিয়া রাজা মহাশয় ত আসন ছাড়িয়া উঠিলেন, আবার বসিয়া চামরজাত বাতাসে মাথাটা একটু ঠিক করিয়া লইলেন, তারপর বলিলেন—'হারে ব্যাটা তুই আমার রাজ্যি শুদ্ধু মানুষ অস্থির করে তুলেছিস্ তোর আজ আর নিস্তার নেই। তার উপরে 'ব্রহ্মং জানাতি ব্রাহ্মণঃ,' তুই কি না সেই ব্রাহ্মণের অপমান করিস্! সে ব্রাহ্মণ আবার আমার সভাপণ্ডিত দেখেও তোর ভয় হোল না তায়।'

"কিসের ভয় মহারাজ?" তখন তাহার নেশা ছুটে গেছে। "মরার ভয়! মরে, সেইখানেই যাব যেখানে আছি? তার আবার ভয় কি মহারাজ। আর মহারাজ আমি ত আপনার পণ্ডিতের অপমান কিছু করিনি, শুধু আপনাদের কে ঈশ্বর আছে তাই দেখতে চেয়েছিলাম দেখাতে পারেননি তাই ছেড়ে দিয়েছি। আচ্ছা মহারাজ আপনি আমাকে পারেন সেই ঈশ্বরকে দেখাতে? পারেন কি মহারাজ!"

"আরে ব্যাটা! ঈশ্বর না থাকলে এ সব চন্দর সূয্যি এ আস্‌লো কোত্থেকে রে?"

"সব প্রকৃতি মহারাজ! সব প্রকৃতি! ঈশ্বর নেই!"

"দশ দিন পরে আসিস্ দেখাব তোরে ঈশ্বর। যাঃ"

"যে আজ্ঞা মহারাজ।" বলিয়া সে গাহিতে গাহিতে চলিতে লাগিল।

(৪)

সন্ধ্যা কাল। গাছের পাতার আড়াল দিয়ে উঁকি মারতে মারতে চাঁদ উপরে উঠ্‌ছে। এমন সময় সেই নদীর তীরে বসিয়া নাস্তিক গাহিতেছে—

"কে বলে তোয় কালো?
ইন্দ্র ধনুর স্বপন দেখিস্
চন্দ্র রেণু গায়ে মাখিস্,—"

সেই সময় তাহার পাশ দিয়ে একটী তরুণ যাচ্ছিল, তাকে ডেকে নাস্তিক

মধুর স্বরে বল্লে খোকা তোমার নাম কি?

আমার নাম অমরেশ। সে বল্লে।

আচ্ছা তুমি কি ঈশ্বর বিশ্বাস কর?

হ্যা নিশ্চয় করি। আমরা হিন্দু; দেবতাই যে আমাদের যথা সর্ব্বস্ব; তাতে বিশ্বাস থাকবে না কেন? তুমি বিশ্বাস কর না?

উহুঁ। আচ্ছা আমাকে দেখাতে পার তোমাদের ঈশ্বরকে?

হ্যা নিশ্চয় পারি! ঈশ্বর ত সর্ব্বত্রই বিদ্যমান; আচ্ছা তুমি ঐ দিব্যশঙ্খ-ভুষাভা চন্দ্রমা দেখছ; ঐ যে তার পাশে ঐ শুক তারা দেখছ ও সব কি? এই যে তোমার চোখের সামনে দিয়ে কুলু-স্বরে 'কথা কয়ে' যাচ্ছে তটিনী এ সব কি তুমি মনে কর?

ও সব প্রকৃতি।

আচ্ছা সেই প্রকৃতিটে কি? সে আস্‌ল কোথা থেকে?

প্রকৃতি ত চিরকালই প্রকৃতি; তার আবার জন্মাজন্ম কি?

আছে বই কি? তোমার আমার যেমন জন্ম হইয়াছে পিতা মাতা হতে, এর এই সব তুমি যাকে প্রকৃতি বলছ, সে সব জন্ম নেছে পরমেশ্বরের পদতল হতে। তোমার প্রকৃতির জন্ম সেই পরম পুরুষের পদতলে দ্বারা। তুমি আগে যেমন ছোট্ট এতটুকু ছিলে তারপর এতবড় হয়েছ, এই সেইরূপ সূক্ষ্মতম ছিল তারপর বিধাতার লালন পালনে এতবড় হইয়াছে; তারপর ত প্রকৃতি।

তাই কি? চিন্তান্বিত ভাবে বলিল নাস্তিক।

হ্যা।

আচ্ছা তবে বিদায় এখন। দেখা হবে পুনরায়

আচ্ছা।

* * * *

দুদিন পরে সবাই দেখ্‌ল সেই নাস্তিক এখন পরম ভগবদ্ভক্ত। সে

এখন প্রকৃতির নাম কারও মুখে শুন্‌তে পেলে তাকে তেড়ে যেমন হনুমান 'মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি।' এ সময় আর সে বাজে নাম নেই এখন হয়েছে সে তারিণীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ। এখন সকালে উঠে প্রাতঃস্নান ক'রে সে —

ন জানামি পূজনং ন চ ন্যাস যোগং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি…

গাহিতে গাহিতে বাটী যায়।

শ্রীসুশীলকুমার রায় চৌধুরী,
(১ম শ্রেণী)।

THE PLACE OF GRAMMAR IN TEACHING OF ENGLISH.

[SYNOPSIS :— What grammar signifies— its scope— object of teaching— its functions— methods to be followed in its teaching— conclusion.]

In a wider sense grammar can be defined as the science of the right use of language. English grammar signifies that book which teaches us how to read, write and speak the English language correctly. But, grammar, as a rule, deals mainly with the written language.

The main constituents of grammar in all cultivated languages are, (1) Accidence i. e. inflection of words and (2) Syntax.

Accidence means the changes of forms to which certain class of words are subject, in order to express corresponding changes of sense. It deals with the distinction of words into kinds or classes based upon the different parts that words have to play in the forming of sentences. It is the foundation of all grammars.

The function of syntax is to explain the power which one word has over another to determine its form and relations with other parts of the sentence.

There has been a hot controversy as to the formal teaching of grammar. Some hold that grammar should not be taught at all by any formal method. Any one who reads good literature will unconsciously and inevitably pick up as much grammar as he has need to know. Others insist that grammatical questions should be solved in the course of teaching of literature. However these views are not tenable. Some amount of formal teaching

is necessary on account of the probable occasional pitfalls due to the defective characteristics of the language itself.

The object of grammar teaching will be clearly manifested from the following points :—

(i) Grammar is taught to strengthen the pupil's mind and to stimulate his interest and knowledge.

(ii) It is taught to teach him the weak points of English language so that he may learn how to avoid the dangers af ambiguity.

(iii) To prepare him for the study of other languages. It is a well known fact that all languages, extant on the surface of the globe, first originated themselves and grammars have been formed out of them. Therefore, instead of saying that a language is governed by its grammar we should say that it is language that governs grammar. Yet the teaching of grammar by any formal method has its educative value. Grammar exposes the weak points of a language which do not fall under the jurisdiction of grammatical laws. So exceptional cases of grammatical importance can be conveniently mastered by the study of grammar.

As a text book grammar reduces what is floating in the memory of the student, it puts everything in its right place, it supplies any point or points that may have been overlooked in oral teaching or not perfectly mastered, it serves as a guide for reference. It provides against many examples especially prepared to illustrate certain points. It facilitates students' learning by heart a rule or definition or a list of important words.

This sort of guidance in the use of a language indirectly strengthens the pupil's mind and stimulates his interest in acquisition

of knowledge. Further, knowledge of one language enables the pupil to master another with less difficulty. Because almost all the main languages current on earth, have many common elements in point of technicalities. But synthetical languages being more firmly fixed than the analytical ones, the importance of grammar in the former is essential.

In the past grammar lesson has frequently been used as a mental exercise in a purely abstract subject. Much time has accordingly been spent and much unnecessary drudgery has been undergone in dealing with grammatical technicalities which are of no real importance. Declining of genders, parsing of nouns and classification of verbs— weak and strong, committing a list of Prepositions, Adverbs and Conjunctions to memory, were superfluous if not harmful. This sort of treatment was due to the fact that grammarians acted on a principle applicable only to highly inflected languages such as Latin, Arabic or Sanskrit. But as a matter of fact English grammar need not be treated in that way.

In the case of English language the practice of learning grammatical definitions by rote, is also to be discouraged. Because the definitions supplied by those grammarians are not exact, and moreover the functions of words cannot be determined by their application. The use and function of words can be understood by a recognition of their relations and not by an investigation of their forms. At the same time the formal teaching of grammar cannot be wholly given up. A child should know the functions of the principal parts of speech and the rules on which the construction of a sentence is based, This indispensable knowledge

of grammar cannot be left entirely to incidental teaching in connection with reading and composition. The knowledge of grammar is really useful only when it is free from obsolete and burdensome pendantries. Without being burdened by formal definitions or perplexed by difficult exceptions, the child may properly be acquainted with the elementary terms such as subject, object, singular, plural, active, passive and auxiliary. These can not undoubtedly burden the child's mind, rather their use tends to economy of time and lucidity of explanation.

A knowledge of grammar will prove useless if a child fails to apply it to correcting his own English and to ascertain the precise meaning of any difficult passage which he may come across in his text-books. It is not uncommon among our boys that they cannot apply or make use of the rules already learnt by rote, in correcting their commonplace mistakes. But if they are taught to apply those rules in the course of daily lessons the purpose of grammar teaching will be served in its true sense.

In conclusion it may be said that whatever difference of opinion there might be, the place of English grammar in the schools of Bengal, is undoubtedly conspicuous. Foreign as the English language is, we can not at all do without the aid of its grammar, at least to guard ourselves against the pilfalls arising out of the complicated idioms, phraseology and exceptional technicalities which constitute the most important features of the language.

EDITOR.

EDITORIAL.

OURSELVES :

Innumerable thanks are due to the Almighty God who has enabled us to bring the current issue of the magazine to light in due course. Besides, our heartfelt gratitude is, also due to Him for His granting us a period of time actually undisturbed and unalloyed, for a harmonious and honest discharge of the duties entrusted to us.

We regret much to announce the sad and untimely death of master Aswini Kumar Mittra of the 4th. class, who was snatched away from our midst by the inclement Cholera, in November last. Master Aswini Kumar was a bright and promising boy. We heartily mourn his loss and sincerely condole with his bereaved parents, class-mates and relatives.

We also express our intense sorrow to have been deprived of the company and service of our worthy Assistant Head-master, Babu Biraja kanta Ghosh M. A. B. L., who leaves us to join the Bar and try his luck in a new sphere of activity. We bid him a hearty send-off and wish him a long life and prosperous career. To fill up the vacancy authorities have appointed an experienced teacher Babu Upendranath Chatterjee B. A. B. T. who is expected to join early.